অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়

ড. এম ইদ্রিস আলি

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাবলী

তাম্রলিপি

অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়
ড. এম ইদ্রিস আলি

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : .....

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
.....

মূল্য : ০০

Ovisopto Ongorio
By : Dr. M Idris Ali
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : .....00 $.....

ISBN : .....

উৎসর্গ

১৯৭১ সালে আমাদের গৌরবান্বিত মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে।

লেখকের কথা

বাঙালির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হলো গৌরবান্বিত মহান মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা লাভ। এই স্বাধীকারের জন্য আমাদেরকে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় ক্রাক ডাউনের পরে পকিস্তানিসেনারা ধীরে ধীরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জেলা ও মহকুমা শহরগুলোকে দখল করে নেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে তারা ঢাকা হতে ফরিদপুরে ঢুকে। গোয়ালন্দ ঘাট হতে ফরিদপুর আসার পথে পাকিস্তানিসেনারা গান পাউডার দিয়ে রাস্তার পার্শবর্তী বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় এবং শত শত লোককে হত্যা করে। পরবর্তীতে নরপিশাচ পাকিস্তানিবাহিনী তাদের দোসরঃ রাজাকার, আলসামস, বিহারিগুন্ডা এবং মুসলিমলীগ-জামাতীদের সহায়তায় ছাত্র-যুবক-জনতা, বিশেষ করে আওয়ামীলীগ এবং হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়, লুটতরাজ করে, নারীদের বলৎকার করে এবং নিরাপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমাদের অঞ্চলেও অনেকগুলো মর্মভেদী এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। সেই সব সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে আমার লেখা বই "অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়"। বইয়ের আটটি গল্পের ঘটনাগুলো আমার নিজের দেখা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। শেষ গল্প "অসমাপ্ত প্রতিশোধ"-এর মূল ঘটনাটি ফরিদপুরের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ফয়েজ আহমেদের কাছ থেকে শোনা। এর জন্য আমি ফয়েজ ভাইকে ধন্যবাদ জানাই।

পরবর্তী প্রজন্মের কেউ যাতে কোনো আত্মজনদের নেতীবাচক ভূমিকার জন্য বিব্রতবোধ না করেন, তার জন্য কয়েকটি গল্পে ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আসল নাম ব্যবহার না করে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

বইটিতে ছোট গল্পের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখা হলেও কোনোক্রমেই ঘটনার আসল মেরিট বা পরিপ্রেক্ষিতকে সামান্য অবহেলা করা হয়নি। আমার পরম

শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় শিক্ষক, বাংলাদেশের স্বনামধন্য পদার্থবিদ ড. রানা চৌধুরী আমার বইটির মুখবন্ধ লিখে বইটির মান সমুজ্জ্বল করেছেন। স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটি প্রকাশে উৎসাহ এবং নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমার বন্ধু আহসান নবাবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাম্রলিপি প্রকাশনী স্বপ্রণোদিত হয়ে বইটি প্রকাশ করেছেন। এইজন্য তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বইটিতে হয়তো কিছু ভুলভ্রান্তি এবং বানান বিভ্রাট রয়ে গেছে। আশাকরি পাঠকবৃন্দ সেগুলো ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

ড. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম ইদ্রিস আলি, পিএসসি (অব.)
ঢাকা: ৩০ জানুয়ারি ২০২৪

মুখবন্ধ

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিদের জন্য সর্বাধিক গৌরব এবং সম্মানের বিষয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে দীর্ঘদিনের বৈষম্য, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটিয়ে আমরা বাঙালিরা একটি স্বাধীন দেশ, একটি নিজস্ব জাতীয় সংগীত এবং একটি লালসবুজের পতাকা লাভ করি।

কিন্তু এই স্বাধীনতা সহজে আসেনি। এর জন্য জাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা লাভ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে শুধুমাত্র রণাঙ্গনে নয়; বাংলাদেশের শহর, গ্রাম-গঞ্জে অগনিত কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতি, ছাত্রজনতা পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং দেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলসামস ও দালালদের হাতে নানাভাবে অত্যাচারিত হয় এবং নিমর্মভাবে হত্যার শিকার হয়। এর ফলে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য মর্মভেদী এবং হৃদয়বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয়।

লেখক, গ্রুপ ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যায়নকালে আমার একজন প্রিয় ছাত্র ছিল। সে ফরিদপুর জেলার শহরতলীর একটি গ্রামের অধিবাসী এবং ১৯৭১ সালে সে নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তানিসেনারা ঢাকা হতে ফরিদপুরে ঢোকার আগে বন্ধুদের সাথে স্টেডিয়ামে রাইফেল চালানোর ট্রেনিং নিলেও বয়সের কারণে ইদ্রিস আলি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেনি। তবে, বাবা ও ভাইদের উৎসাহে এবং সহযোগিতায় সে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো ফরিদপুর অঞ্চলেও পাকিস্তানিসেনারা অনেক অত্যাচার-নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ইদ্রিস আলি তার নিজস্ব এলাকা এবং আশেপাশের অঞ্চলে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো ঘটনার সাক্ষী হয়ে যায়। এরকম কয়েকটি সত্য ঘটনা নিয়ে তার মুক্তিযুদ্ধের গল্পের বই

"অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়"। গ্রুপ ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সবগুলো ঘটনার আসল মেরিট এবং পরিপ্রেক্ষিত ঠিক রেখে নিজস্ব সাহিত্যালঙ্কার এবং শিল্পশৈলী কৌশল ব্যবহার করে সেগুলোকে পাঠকপ্রিয় করে তুলেছে। সবগুলো ঘটনার বর্ণনায় সে আদর্শ ছোট গল্পের সকল গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখতে দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছ। সে তার প্রতিভাপ্রোজ্জ্বল সৃজনীশক্তি দিয়ে বক্ষমান গল্পগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে, ৫২ বছর আগে সংগঠিত কাহিনিগুলোকে সদ্য ঘটে যাওয়া জীবন্ত চিত্রপট মনে হবে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলি ইতিমধ্যে তার নিজের রচিত কবিতার বই এবং বিমান প্রকৌশলের ওপরে বিজ্ঞানবিষয়ক বই প্রকাশ করেছে।

এই বইয়ের একটি গল্পের শিরোনাম হতে নেয়া বইটির নামকরণ "অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়" সঠিক এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। বইয়ের গল্পগুলো পড়ে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একদিকে যেমন পাকিস্তানিবাহিনীর অত্যাচার ও নিমর্মতার কিছু ঘটনা জানতে পারবে, অন্যদিকে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারবে। আমি এই বইটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং পাঠক সন্তুষ্টি কামনা করছি।

ড. রানা চৌধুরী
অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান
বীরমুক্তিযোদ্ধা, সেকটর-৫

সূচিপত্র

সাহার মেয়ে গর্ভবতী	১৩
কবর খোঁড়া জয়েনদ্দিন	২২
আমার বন্ধু কামাল	৩০
কুলসুমের বাসর ঘর	৪০
সোবান মৌলানার ভীমরতি	৪৬
একজন মুক্তিযোদ্ধার রক্তমাখা ডায়রি	৫২
শোভাষিনীর আর্তনাদ	৬০
অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়	৬৯
অসমাপ্ত প্রতিশোধ	৮০

সাহার মেয়ে গর্ভবতী

কুমার নদীর উপর আলিমুজ্জামান ব্রিজ, তার দক্ষিণ দিকেই ফরিদপুর জেলা শহর। পুরোনো চকবাজার, আজম মার্কেট, জজকোর্ট, পুলিশ লাইন, জেলখানা, ঐতিহ্যবাহী রাজেন্দ্র কলেজ সবই নদীর ওপার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। বর্তমান নিউমার্কেট, যার নামকরণ হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আজম খানের নামে। একসময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিল এক বাঙালি খান মোনায়েম খান। অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের প্রকৃত দোসর ছিল মোনায়েম খান। তাই তো উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময় একটি স্লোগান ছিল 'আইয়ুব-মোনায়েব দুই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই'। আজম খান অবাঙালি হলেও বাঙালিদের প্রতি তিনি সংবেদনশীল ছিলেন।

আজকে রোববার, হাটবার। ফরিদপুর শহরে দু'টি হাটবার: রবিবার ও বুধবার। তবে, রবিবারের হাটটি বেশি জমে; দূর-দূরান্ত হতে মানুষ ধান, পাট, তরিতরকারি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে বেচাকেনা করে। দোকানে সাজানো কাপড়রচোপড় এবং মুদি সামগ্রী ইত্যাদি ছাড়া প্রায় সবকিছুই কুমার নদী হয়ে মানুষজন নৌকা করে আনা নেওয়া করে।

২৫ মার্চে পাকিস্তান বাহিনী ঢাকাতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর হতে দুই তিন মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো জেলা ও মহকুমা শহরে পাকিস্তানি আর্মি প্রবেশ করেছে এবং স্থানীয় জামায়াতে ইসলাম, নিজামী ইসলাম ও মুসলীম লীগ নেতাদের সহযোগিতায় প্রশাসনিক কাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

ফরিদপুরে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রবেশ করেছে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে। শহরে ঢুকার পথে রাজবাড়ি-ফরিদপুর রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল ঘর সবকিছু ফ্লাশ গান দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে জনশূন্য করেছে। শহরে প্রবেশের আগেই শ্রীঅঙ্গনে জগবন্ধুর মন্দির হিন্দু ধর্মালম্বীদের একটি তীর্থ স্থান। পাকিস্তানি সৈন্যরা মন্দিরে ঢুকে প্রার্থণারত আট জন সাধুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। চারদিকে ভয় ও আতঙ্কে। পাকিস্তানি সেনা ও

রাজাকার-আলবদরদের ছায়াতলে থেকে জামায়াত ও মুসলিম লীগের গুন্ডারা হিন্দুদের দোকান, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান দখল করেছে এবং বাড়িঘর লুটতরাজ করেছে। ইতিমধ্যে শহরঘেঁষা গ্রামগুলোর হিন্দুরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এবং অনেকে যশোর বর্ডার দিয়ে ভারতে চলে গেছে। তবে এখন অবস্থা স্বাভাবিক দেখানোর জন্য শহর এলাকার হিন্দু বাড়িতে যাতে লুটতরাজ না হয় তার জন্য শান্তি কমিটির লোকজন পাহারার ব্যবস্থা করেছে; এবং হিন্দু লোকজন যাতে বাড়িঘর ছেড়ে চলে না যায় তার জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সার্কিট হাউজে মেজর এজাজ সাহেব হিন্দু নেতাদের ডেকে সাহস ভরসা দিয়েছে। তারপরেও কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার থেমে নাই।

আলিমুজ্জামান ব্রিজের এপারে নদীর পাড়ে ছোটো কাঁচাবাজার, তার গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ফরিদপুরের অতি পুরাতন পতিতালয়। স্থানীয় মুসল্লিদের বাধাবিপত্তির ফলে পতিতালয়টি কয়েকবার উঠে গেলেও প্রভাবশালী মাতুব্বর, নেতা ও প্রশাসনিক আনুকূল্যে পুনরায় গড়ে উঠেছে নিজ মহিমায়। শহরে মিলিটারি প্রবেশ করার পরদিনই ওখানে বন্দি জীবনযাপনকারী প্রায় শতেক দুয়েক পতিতা পালিয়ে গেছে গ্রামের দিকে ধর্ষিতা হবার ভয়ে। ওখানে এখন লাগানো হয়েছে আরবি বাংলা অক্ষরে লেখা একটি মাদ্রাসার সাইন বোর্ড।

পতিতালয়ের পশ্চিম দিকে নদীর উত্তর পারের জায়গাটির নাম রথখোলা। এখানে প্রায় শতখানেক হিন্দু পরিবার বাস করে। তার ভেতর অধিকাংশই বেশ ধনী ও প্রভাবশালী। ফরিদপুর শহরের বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে বসবাসরত হিন্দুদের কব্জায়। এর মাঝে আবার কয়েক ঘর কায়া, যাদেরকে বোম্বাইয়া বলা হয়; এরা খুব খানদানি হিন্দু এবং হিন্দিভাষাভাষী। ফরিদপুরের সবচেয়ে বড়ো এবং জৌলুসময় দূর্গাপুজার মণ্ডপ হয় রথখোলা মাঠে, এবং বিজয়া দশমীর দিনে শহরের আশেপাশে নির্মিত দূর্গাপূজার প্রতিমাগুলো রথখোলা মাঠে আনা হয় একত্রে নদীতে বিসর্জনের জন্য। এ উদ্দেশ্যে মাঠের মধ্যে এবং নদীর পাড়ে পূজা মণ্ডপের সামনে বসানো হয় বিজয়া দশমী মেলা। সে মেলায় হিন্দু মুসলমান সবাই আসে বেচাকেনার সাথে একটু আনন্দ করতে।

এ পাড়াতেই বাস করেন মনু সাহা, ভালো নাম মনিন্দ্রকুমার সাহা। ফরিদপুর আজম মার্কেটে তার একটি শাড়ীর দোকান 'ভবতি বস্ত্রালয়"। স্বর্গবাসিনী মা শ্রীমতি ভবতি পুষ্পরাণীর নামে নামকরণ। মনু সাহার বাবা

ধিরেন সাহাও কাপড়ের ব্যাবসা করতেন নারায়নগঞ্জে। মনু সাহার ছোটো পরিবার। স্ত্রী মালতী রাণী সাহা, মেয়ে শ্রীলতা সাহা ও ছেলে শ্যামল চন্দ্র সাহা। শ্রীলতার বয়স ১৫ বছর, ইশান গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। মায়ের গঠন এবং গায়ের সুন্দর রং পেয়েছে মেয়েটি; বয়সের তুলনায় শরীরের বাড়ন্ত একটু বেশি-মোটামুটি সুন্দরী বলা চলে। লেখাপড়াতেও বেশ ভালো—ক্লাসে সেকেন্ড গার্ল। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সেকেন্ড গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে সে। মা-বাবার অতি আদরের মেয়ে শ্রীলতার গানের গলাও বেশ। টেপাখোলার কৃষ্ণবালার কাছে গান শিখেছে সে; রবীন্দ্র সংগীত ও রজনীকান্তের গান। তাছাড়া, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো শ্রীলতার কণ্ঠে দারুণভাবে নাম করেছে।

সারা দেশে উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্কের মধ্যে মানুষ বাস করছে। ফরিদপুরের অবস্থাও একই রুপ। প্রথম দিকে গণহত্যা, লুটপাট বেশি হলেও অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল জুন জুলাই-এর দিকে। এখন পরিস্থিতি দিনদিন আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে। দলে দলে তরুণরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে এবং শহরের বাইরে প্রায়ই চোরাগুপ্তা হামলা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার আলবদরদের পাহারায় থাকা পুল, কালভার্ট বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিছু কিছু গ্রাম্য কুখ্যাত দালাল ও পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদেরকে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করছে। কাজেই দিনদিন বাঙালিদের প্রতি মিলিটারিদের সন্দেহ ও ঘৃণা বাড়ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য অবস্থানকারী অনেক গ্রাম পাকিস্তানিসেনারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং সন্দেহভাজন লোকজন, বিশেষ করে যুবকদের ধরে এনে অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করছে।

ফরিদপুরে মিলিটারি আসার পর মনু সাহা শ্রীলতার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় রাজাকার লিডার আলাউদ্দিন মোল্লা ও কালু বিহারি এসে হুমকি দিয়েছে, 'মেজর সাহেবের অর্ডার–মেয়েকে স্কুলে না পাঠালে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে।' মনু সাহা ভয়ে বিনিদ্র রাত কাটায় এবং কোনো উপায়ান্তর না দেখে ভগবানের নাম করে শ্রীলতাকে আবার স্কুলে পাঠাতে শুরু করে। তবে স্কুলে যেতে আসতে মেয়ের সাথে তার মাকে পাঠায় এবং রাস্তায় যাতে রিকশার হুট উঠিয়ে চলে তার জন্য মা মেয়েকে কড়া নির্দেশ দেয়।

নভেম্বরের শুরু থেকে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। স্মরণাতীত কালের বন্যার পানিতে এখনো গ্রামগঞ্জের মাঠঘাট জলমগ্ন

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শাপেবর হয়েছে ৭১-এর বন্যা। বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় রাজাকার, আলবদর ও দালালদের সাথে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে জীবন দিচ্ছে। এর সাথে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার ও পৈশাচিকতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রায়ই পরানপুর, ধুলদী ও কানাইপুরে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে গৃহবধূ ও যুবতি মেয়েরা। শোনা যাচ্ছে ফরিদপুর স্টেডিয়ামে মিলিটারি ক্যাম্পে মেয়েদের প্রতি বলৎকার করা হচ্ছে; নিশিত রাতে মেয়েদের করুণ আর্তনাদ এবং কান্না শুনা যাচ্ছে। শান্তিকমিটির কিছু জুনিয়র কর্মী, জামাতি রাজাকার, আলবদর ও দালাল শ্রেণির কিছু লোক মিলিটারি অফিসারদের চাহিদা ও খায়েশ মিটানোর জন্য বিভিন্ন স্থান হতে, বিশেষ করে আওয়ামীলীগপন্থি এবং হিন্দুদের যুবতি মেয়ে ও গৃহবধূদের ধরে এনে ক্যাম্পে জোগান দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে শহরের কয়েকজন পাকিস্তানপন্থি প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হিন্দুদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করছে, এবং লালসার খাতিরে জোর করে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করেছে। মুসলিম লীগ নেতা সোবান মোল্লা ৬০ বছর বয়সে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর মাথায় টুপি পরিয়ে এবং কলেমা পড়িয়ে তার ১৭ বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে করেছে। কাজেই যে সকল হিন্দু পরিবারে যুবতী সুন্দরী মেয়ে আছে তারা খুবই আতঙ্কে সময় কাটাচ্ছে—কখন কি যে হয়ে যায়!

এ পাড়ায় বসবাসরত সব হিন্দু পরিবারের মতো মনু সাহার পরিবারেও কারো চোখে ঘুম নাই। বিশেষ করে লতার মতো বাড়ন্ত মেয়েটিকে নিয়ে বাবা মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নাই। সারাক্ষণ আতঙ্কে সময় কাটে—এই বুঝি কোনো অঘটন ঘটে যায়! স্বামী স্ত্রী মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে, মেয়ে মেট্রিক পাশ করার পরই পরানপুরের দীপক সাহার ছেলে সম্ভু সাহার সাথে ভালো দিনক্ষণ দেখে বিয়ে দিয়ে দেবেন। দুই পরিবারের এই বিয়েতে সম্মতি আছে। দীপক সাহার আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও সম্ভু ছেলে হিসেবে খুবই সুন্দর ও মেধাবী। কোমরপুর স্কুল হতে প্রাইমারি ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় ১ম গ্রেডে বৃত্তি পাওয়ার পর একই স্কুল হতে ৪টি লেটারসহ মেট্রিক পাশ করেছে। অতঃপর রাজেন্দ্র কলেজ হতে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করার পর ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকাতে মনু সাহা সম্ভুর লেখাপড়ার ব্যাপারে দীপক সাহাকে নানাভাবে আর্থিক সহযোগিতা করে আসছে। ইতিমধ্যে দুই পরিবারের সম্মতি ও

সিদ্ধান্তের কথা শ্রীলতা ও সম্ভু উভয়ই জেনে গেছে। গত বছর পূজার ছুটিতে দুজনের সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে এবং দুজনেই মনে মনে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছে।

রবিবার হাটবার দিন–অন্য দিনের তুলনায় শহরে লোকজনের আনাগোনা একটু বেশি। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। শ্রীলতার আজ অঙ্ক পরীক্ষা। সে পূর্ব পরিচিত জয়নালের রিকশায় স্কুলে পৌঁছে যায় সকল দশটার আগেই। পরীক্ষা শুরু হয়েছে ঠিক সাড়ে দশটায় আমজাদ দপ্তরির ঘণ্টার বারিতে। কিছুক্ষণ পরে ধর্ম শিক্ষক তাইজদ্দিন মাওলানা সবাইকে জানায়, মেজর সাহেব পরীক্ষার হলে ছাত্রীদের উপস্থিতি দেখতে স্কুলে আসছেন। হঠাৎ যেন বজ্রপাত হয়! অজানা আতঙ্কে সবাই কাঁপতে থাকে।

ইশান স্কুল শহরের একটি খ্যাতনামা পুরোনো স্কুল। জমিদার ইশানচন্দ্র বিশ্বাস ১৯১৮ সালে এই দৃষ্টিনন্দন স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। দোতলা দালানের নিচতলার সর্ব দক্ষিণের কক্ষে শ্রীলতাদের পরীক্ষার সিট পড়েছে। বেলা ১১ টার দিকে খট্‌খট্ বুটের আওয়াজে মেয়েদের বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। শ্রীলতা বেঞ্চের বামপাশে দরজার দিকের সর্বশেষ সিটে বসেছে। দু'তিনজন আর্মি অফিসার স্থানীয় শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্যসহ ক্লাশ রুমে প্রবেশ করে পিছনের দিক থেকে শ্রীলতার বেঞ্চের দিকে আসে। মেজর সাহেব শ্রীলতার সামনে এসে প্রশ্ন করে 'তোমহারা নাম কিয়া হায়–What is your name?' শ্রীলতা ভয়ে ভয়ে অতি নম্র ও মৃদস্বরে নিজের নাম বলে, শ্রীলতা সাহা। ওহ!–তুম হিন্দু লারকি হো? মেজর সাহেব একটু মুচকি হেসে আবার প্রশ্ন করে। শ্রীলতা নীরবে মাথা নিচু করে মেজর সাহেবের চকচকা কালো বুটের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে মেজর সাহেব অন্য দুজন অফিসারের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসে এবং সাথে শান্তি কমিটির সদস্য আলাউদ্দিন মৌলবির দিকে তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করে। এরপর তারা সকলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেলেও এক অজানা আশঙ্কায় শ্রীলতার বুকের মধ্যে ভীষণ ধড়ফড়ানি শুরু হয়–যার আওয়াজ সে নিজেই শুনতে পায়। কোনো রকমে পরীক্ষা শেষ করে মেয়েরা যার যার মতো বের হয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। শ্রীলতা ক্লাস রুম হতে বের হয়ে চীনামাটির ভাঙ্গা স্লেটে নির্মিত সিঁড়িতে পা দিতেই হেড মাস্টার সাহেব সামনে এগিয়ে আসেন; সাথে সেই শান্তিকমিটির নেতা'।–শোন খুকি, তোমার এখন বাড়ি যাওয়া হবে না, মেজর সাহেব

তোমার সাথে একটু মোলাকাত করবেন। চিন্তা করবা না, সন্ধ্যার আগেই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। এ কথায় শ্রীলতার চারিদিকের পৃথিবী ছোটো হয়ে আসে; তাকিয়ে দেখে আশে পাশে কেউ নাই–শুধু জলপাই রং এর একটি মিলিটারি জিপ। ফাঁসির আসামির মতো ওকে দু-তিন জনে ধরে ওই জিপটির দিকে নিয়ে যায়–যেন সামনে একটি ফাঁসির মঞ্চ। শ্রীলতার পাদুটি ভারী হয়ে যায়, দু-চোখে ঝাপসা দেখে। তারপর সে এক সময়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

জয়নাল খালি রিকশা নিয়ে বাসায় ফিরে। মালতী রাণী সাহা মেয়ের সর্বনাশের খবর পেয়ে মূর্ছা যায়। ইতিমধ্যে শহরে খবরটি বিদ্যুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মনু সাহা দোকানপাট রেখে বাড়ির দিকে দৌড়ায়। স্ত্রী মালতী তখনো বারান্দায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। পাড়ার মাথা জগদীশ সেন এবং বাজার কমিটির সেক্রেটারি ইমাজদ্দিন প্রামানিককে সঙ্গে নিয়ে মনু সাহা ফরিদপুর শান্তিকমিটির সভাপতি আফজাল উকিলের সাথে দেখা করে এবং মেয়েকে আর্মি ক্যাম্প হতে উদ্ধারের জন্য অনুনয় বিনয় করেন। শান্তি কমিটির সভাপতি বলেন, '–দেখ মনু সাহা, এখন হিন্দুস্তানি কাফেররা আর ওদের জারজ সন্তানরা সীমান্তে এবং সারা দেশে গুপ্ত হত্যা শুরু করেছে। পাকিস্তানি মেজর সাহেব এখন খুবই ব্যস্ত–দেশ রক্ষার চিন্তায়। তার সাথে এখন দেখা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তোমার মেয়ে তো আর সারাজীবন ওখানে থাকবে না। দু–একদিন পরেই বাসায় ফিরে যাবে–সে ব্যবস্থা আমি করব। দেশ রক্ষার জন্য এতটুকু ত্যাগ তো আমাদের সবার করা উচিত, কি বলো ইমাজদ্দিন? 'হ, উকিল সাহেব, আপনি তো ঠিকই বলেছেন। আমাদের প্রিয় পাকিস্তান রক্ষা করতে এতটুকু কোরবানি তো সবারই করা উচিত, ইমাজদ্দিন জবাব দেয়।

একদিন দুদিন নয়, সাত দিন পর শ্রীলতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেদিনও ছিল হাটবার। মানুষের ভিড় ঠেলে কালো বোরকা পরিয়ে কালু বিহারির লোকেরা শ্রীলতাকে সন্ধ্যায় বাসায় পৌঁছে দেয়। মনু সাহার বাড়িতে মানুষের ভিড় বাড়ে। পরনে সেই স্কুলের মেরুন বর্ণের কামিজ আর সাদা সালোয়ার; অনেকটা বিবর্ণ ও ময়লা কামিজের কয়েক জায়গায় ছেঁড়া, সাদা পাজামায় রক্তের ছোপ ছোপ দাগ–ঠিক গাঢ় লাল নয়, হলদেটে লাল। লম্বা চুল উশকোখুশকো, চোখ দুটি কিছুটা কোটরগত, কপোলের তিলে বিষাক্ত আঁচড়; দুগাল কিছুটা ঝুলে পড়েছে। ঘটনায় নির্বাক নিস্তব্ধ পনেরো বছরের

সেই লাস্যময়ী তরুণী আজ বিধ্বস্ত বিপদগ্রস্ত। পাড়া প্রতিবেশীদের কানাঘুষো–আত্মীয়স্বজনের তীর্যক মন্তব্য। সবকিছু মিলিয়ে এই ঘটনা পুরো পরিবারকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। মালতী রাণী মেয়েকে বুকে নিয়ে দরজায় খিল দিয়েছে বদনাম এবং অস্বস্তিকর প্রশ্নবান থেকে বাঁচবার জন্য। মনু সাহাও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কিছুটা; এখন আর দোকানে বসে না–বাসায় ডেকে কর্মচারীদেরকে নির্দেশনা দেয়। সে মনে মনে স্থির করে ফেলে, আর নয় এখানে; দেশের অবস্থা একটু ভালো হলেই সবাইকে নিয়ে বেনাপোল হয়ে ভারতে চলে যাবেন। স্ত্রী মালতী রাণীও পরিস্থিতির বিবেচনায় একমাত্র মেয়েকে বদনামের হাত হতে রক্ষা করতে স্বামীর কথায় সায় দেয়।

ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে বড়ো শহরগুলোতে গেরিলা আক্রমণ করে ব্রিজ, কালভার্ট উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদলের চলাচল সীমিত করে ফেলেছে। দেশের প্রধান প্রধান ব্রিজ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় পাহারায় নিয়োজিত রাজাকার, আলবদররা পালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের ভয়ে। দু'তিন মাসে ঢাকা শহরে ডিআইটি ভবন; টেলিফোন ভবন ও বিদ্যুত টাওয়ারে মুক্তিযোদ্ধারা দুঃসাহসিক গ্রেনেড হামলা করেছে। রাজবাড়ির পাংশা ও গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে মুক্তিযোদ্ধারা সাঁড়াশি আক্রমণ করে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা ও বিতারিত করেছে।

এখন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সর্ম্পক্য তলানিতে ঠেকেছে। দুটি দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে নালিশ করছে। ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে এক ঐতিহাসিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় ভারতীয় সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে যশোর ও কুমিল্লা জেলার অভ্যন্তরে ঘাঁটি গেড়ে বসে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে স্থল ও বিমান হামলা শুরু হয়। নবগঠিত স্বাধীন বাংলা বিমানবাহিনী নারায়নগঞ্জের গোদনাইল তেলের ডিপো, চট্টগ্রামের রিফাইনারী প্লান্ট এবং ফরিদপুরে কবি জসিমউদ্দিনের বাড়ির পাশের খাদ্য গুদামে বোমা ফেলে।

৪ ও ৫ ডিসেম্বর শুরু হয় তৃতীয়–সর্বাত্মক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে যুদ্ধের তীব্রতা

আরও বৃদ্ধি পায়। ১৪ ডিসেম্বর যশোর এর পতন হলে শত শত পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হঠে। প্রায় ৭০/৮০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে তারা ফরিদপুরে পৌঁছে বিধ্বস্ত হয়ে। ১৫ই ডিসেম্বর ফরিদপুরবাসী দেখল, ফরিদপুর-রাজবাড়ি রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে প্রায় শতেকখানেক পাকিস্তানিসেনা। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানবাহিনী ঢাকাতে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। একই দিনে ফরিদপুর মহিম স্কুলের মাঠে স্থানীয় এবং যশোর এলাকা হতে পালিয়ে আসা পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র জমা দেয়।

প্রায় নয় মাস পরে মুক্তিযোদ্ধারা সদলবলে ফরিদপুর শহরে ফিরে আসে। ফরিদপুর স্টেডিয়ামে কাঠের রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং করা শাহাদত, মাসুদ, হায়দার আলী, রুমি এবং নিমাই মজনুদের সাথে ফিরে আসে শ্রীলতার বাগ্‌দত্তা স্বামী সম্ভু সাহা। সবারই চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। মাথায় বাবরি চুল, পরনে ময়লা রং চটা প্যান্ট এবং হাতে খোলা স্টেনগান। সারা শহর আনন্দে মাতোয়ারা–জয় বাংলা স্লোগান, –বোমাবাজির শব্দ ও স্টেনগানের গুলির আওয়াজে একাকার। এর মাঝে নতুন করে খুনাখুনি হল। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অনেক বিহারি মুসলমান ও রাজাকার প্রাণ হারাল। কয়েকজন রাজাকারের লাশ গোযালচামট পাট গবেষণা কেন্দ্রের কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলতে দেখা গেল। কুমার নদীতে পানির স্রোতে কচুরিপানার সাথে অনেক যুবকের লাশ ভেসে আসলো।

শ্রীলতা তখনো প্রায় বাক্‌রুদ্ধ ও গৃহবন্ধি। সম্ভু সহ সদ্য যুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে শ্রীলতাকে দেখতে এলো। সবাই সান্তনা দিলো ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, তবে কারো সাথে তার কথা হলো না। শিশির দাসের নেতৃত্বে কয়েকজন ছোকরা সাংবাদিক এলো ঘটনাটি ভালোভাবে জানার জন্য। শ্রীলতা বা তার বাবা-মায়ের সাথে তারা শত চেষ্টা করেও বেশি কথা বলতে পারল না। তবে প্রতিবেশী অনেকে এগিয়ে আসলো সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য এবং ইনিয়ে-বিনিয়ে সেইদিনের পরবর্তীতে শ্রীলতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তার চলাফেরার অবস্থা ইত্যাদি অতি আপনজনের মতো বর্ণনা করল। পরদিন স্থানীয় চার পাতার একটি সংবাদ পত্রিকায় ছাপা হলো, **'সাহার মেয়ে গর্ভবতী'**। সকলে খবরটি পড়ে অনেকে ব্যথিত হল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খবরটি সারা শহরের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। অনেকেই সমবেদনা জানানোর জন্য মনু সাহার বাড়িতে আসলো। শ্রীলতার কয়েকজন

বান্ধবী তাদের মা বোনদের নিয়ে শ্রীলতার সাথে দেখা করতে আসলো। সন্ধ্যায় আম্বিকা ময়দানে মুক্তিযোদ্ধারা মিছিল করল, এবং দোষী পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করল। শ্রীলতা ও তার মা-বাবা ঘর থেকে বের হলো না; কারো সাথে কথাও বলল না।

রথখোলার হিন্দু পরিবারের অনেকে ফিরে এসেছে। নদীর পারের গঙ্গামা মন্দিরে আবার ঢাক বাজল। বহুদিন বন্ধ থাকা পতিতালয়ে যেন প্রাণের সঞ্চরণ হয়েছে। আনন্দের মাঝে কিছু কিছু বেদনাদায়ক ঘটনারও সৃষ্টি হচ্ছে। ফরিদপুর স্টেডিয়াম মাঠের পূর্বদিকের ধানক্ষেতে একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে কয়েকজন যুবতি নারীর ক্ষতবিক্ষত গলিত লাশ পাওয়া গেছে। একটি মেয়ে সম্ভবত গৃহবধূ–তার শাড়ির আঁচলে একটি চাবির গোছা পাওয়া গেছে।

বুধবারের হাটবারের দিন। সকালবেলা নদীর পাড়ে ময়রা পট্টির বাঁশের খুঁটি ঘেঁষা কচুরিপানার মাঝে একটি মেয়ের স্ফীত লাশ দেখা গেল। হাটে মালপত্র নিয়ো আসা নৌকার মাঝিরা এগিয়ে আসলো, পতিতা পল্লির স্নানরত মেয়েরা দৌড়ে আসলো; আলিমুজ্জামান ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচলকারী স্কুলগামী ছেলেমেয়েরা এলো, পুলিশ আসলো। শ্রীলতার মা মালতী রাণীর মূর্ছা যাওয়া দেহ নদীর ঘাটে আছড়ে পড়ল। পরদিন সেই পত্রিকাটিতে আবারও সমবেদনা জানিয়ে শ্রীলতার আত্মহত্যার খবরটি ছাপা হলো।

কবর খোঁড়া জয়েনদ্দিন

ফরিদপুর সদর মহকুমাধীন কোমরপুর একটি স্বনামধন্য গ্রাম। জেলা শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেছে ফরিদপুর-ঢাকা রোড; আর গ্রামটিকে উত্তর দিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কুমার নদী। কোমরপুরে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস। এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছেন হুমায়ুন কবির, আকবর কবিরের মতো বিখ্যাত লোকেরা। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও কবি হুমায়ুন কবির ফরিদপুর ডিস্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান। তারপর রাগে অভিমানে তিনি ভারতে চলে যান এবং পরবর্তীতে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হন।

এই গ্রামেই প্রামানিক বাড়ি বেশ নাম করা পরিবার। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই পরিবারের অনেকে সরকারি চাকরি করে। ফলে বর্তমান প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজে পড়ে। জয়েনদ্দিন প্রামানিক ও কেয়ামদ্দিন প্রামানিক দুই ভাই–কৃষি কাজ করলেও মোটামুটি লেখাপড়া জানে। জয়েনদ্দিন স্থানীয় চরমাধবদীয়া মাদ্রাসা থেকে দুইবার ফেল করে বছর পাঁচেক আগে দাখিল পাশ করেছে। সে কৃষি কাজ করলেও সন্ধ্যা বেলা মিয়াবাড়ি মসজিদে বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার ক্লাশ নেয়। জয়েনদ্দিন প্রামানিক একটি দারুণ পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তার সেই কাজ হলো: কবর খোঁড়া। আশে পাশের গ্রামগুলোতে কেউ মারা গেলে সে ছুটে যায় কবর খুঁড়তে এবং যতদূর সম্ভব, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী জয়েনদ্দিন একাই কোদাল চালিয়ে পুরো কবর খুঁড়ে। তার এই রাত দিন কবর খোঁড়ার পেছনের কারণ হল: তার বিশ্বাস ১০০টি কবর খুঁড়তে পারলে একটি কবর নাকি আল্লাহর তরফ থেকে তার জন্য নাজেল করা হবে এবং সেই কবরে কোনো মুনকার-নাকির ফেরেশতা সওয়াল করবে না। কোরআন হাদিসে এ ধরনের কথা না থাকলেও অনেকে কিন্তু তার কথাটি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ফলে দুর্যোগপূর্ণ রাতে কেউ মারা গেলেও জয়নদ্দিন প্রামানিকের ডাক

পড়ে। জয়েনদ্দিন প্রামানিক কোনো নতুন কবর খোঁড়ার পর একটি নোটবুকে ক্রমিক নম্বরসহ নাম ঠিকানা লিখে রাখে। তার হিসেবে এ পর্যন্ত সে ৮৭টি কবর খুঁড়েছে; অর্থাৎ আর মাত্র ১৩টি কবর খুঁড়তে পারলেই তার আকাঙ্ক্ষিত কবরটি পেয়ে যাবে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১০০টি কবর খোঁড়া পূর্ণ হওয়ার পরেও সে আরও ৪/৫টি কবর খুঁড়বে; তজবির ঘুঁটি গুনে শত কলেমা পড়ার মতো। বলতো যায় না, দু-একটি কবর নিয়ম মতো খোঁড়া না হলে আল্লাহ হয়তো তার কবরটি আটকিয়ে দিতে পারেন।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আইয়ুব খান ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে রণে ভঙ্গ দিয়ে অবশেষে শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলা থেকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছেন এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর হতে কালো নিয়মকানুন প্রত্যাহার করেছেন এবং জেলখানায় আটক হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে ছেড়ে দিয়েছেন। ছাত্রদের বিশেষ আইডি কার্ডের প্রচলন করে হাফ টিকিটে বাসে ভ্রমণ ও সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করে জনদরদি প্রেসিডেন্ট হতে চাচ্ছেন। তবে 'ছাত্ররা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছে'—এই বলে জয়েনদ্দিন প্রামানিক চায়ের দোকানে বসে সমমনা লোকদের সাথে সুযোগ পেলেই নানাভাবে শলা পরামর্শ করছে। কয়েকদিন আগে কোমরপুর স্কুল ফুটবল মাঠে একদল ছেলে **'জয় বাংলা'** স্লোগান দিয়েছে। **'জয় বাংলা'** হলো হিন্দুদের স্লোগান–জয় মা কালী, জয় হরির অনুকরণ। মিয়াবাড়ি মসজিদের বয়স্ক মুসল্লিরা জয়নদ্দিন প্রামানিকের সুরে তাল মিলিয়ে বলতে থাকে, দেশটা রসাতলে যাবে–শেখ মুজিবকে ভোট দিলে পাকিস্তান আর থাকবে না, হিন্দুস্থান হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের তরুণ সমাজের মাঝে দিনদিন পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হচ্ছে। তারা দলবেঁধে আইয়ুব মোনায়েমপন্থি চেয়ারম্যান–মেম্বারদেরকে লাঞ্ছিত করছে এবং কখনো তাদের বাড়িঘরে আগুন দিচ্ছে। অনেক তরুণ ছাত্র তাদের পাকিস্তানপন্থি পিতাদের অবাধ্য হয়ে গণআন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। জনগণ হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে সাড়া দিয়ে ভোটের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭০-এর জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করলেও ইয়াহিয়া খান এবং সামরিক জান্তা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী

হিসেবে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা তালবাহানা শুরু করে। অবশেষে ৭১ এর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হায়েনাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, নারী পুরুষ পাকিস্তানিসেনাদের হাতে নিহত হয়। তাছাড়া, পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে ঢাকা থেকে পালাতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বাইরের শহরগুলোতে প্রবেশ করতে শুরু করে। এপ্রিলের মাঝামাঝি প্রায় হাজার খানেক পাকিস্তানিসেনা ফরিদপুরে প্রবেশ করে, এরপর তারা যশোর ও কুষ্টিয়া দখল করে নেয়।

পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্মম অত্যাচারে শহর ছেড়ে যে সকল ছাত্র-যুবকরা পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অজপাড়াগাঁয়ে চলে গিয়েছিল, তারা অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়। জুলাই-আগস্ট হতে তাদের অনেকেই আবার মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করেছে, এবং স্থানীয় স্বাধীনতাকামী ছাত্র-যুবকদের সহযোগিতায় গেরিলা কায়দায় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছে। ফলে বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনারা নাজেহাল হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের সামরিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য ইতিমধ্যে ঢাকাসহ দেশের জেলা শহরগুলোতে রাজাকার, আলবদর ও আল শামস নামক প্যারামিলিটারি ফোর্স তৈরি হয়েছে। যার সদস্যরা হলো স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালি ও বিহারি যুবকেরা। ফরিদপুর হাইস্কুল মাঠে মাইকিং করে লোক জড়ো করা হয়েছে। আব্দুল আলী মৌলানার ছেলে জামায়াত নেতা মুজাহিদ এবং আফজাল খান সবার উদ্দেশ্যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছে:

'আজ আমাদের প্রিয় জন্মভুমি পাকিস্তান মহা বিপদের সম্মুখীন। ইসলামের দুশমনেরা এই দেশের অস্তিত্ব ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। দেশ ও জাতির হেফাজতের জন্য, দেশপ্রেমিক সাচ্চা মুসলমান ও আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজাকার ও আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদেরকে ভারতীয় চর পূর্ব-পাকিস্তানি দুষ্কৃতিকারীদেরকে খতম করতে হবে।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে অনেকেই ফরিদপুরে রাজাকারে নাম লিখাল। ফরিদপুর পুলিশ লাইন ও চানমারীতে ট্রেনিং শেষে তাদেরকে পুলিশের খাকি পোষাক ও হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল তুলে দেয়া হলো। প্রাথমিকভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারায়

নিয়োজিত করা হলো। কোমরপুরের পাঁচজন রাজাকারের চাকরি নিল। আব্দুর রহমান মোল্লা, নাজিম উদ্দিন শেখ, আলেপ, রওশন খাঁ এবং জয়েনদ্দিন প্রামানিক। আব্দুর রহমান কারীসাহেব নামে পরিচিত এবং ইসলামী ছাত্র সংঘ ফরিদপুর শাখার একজন সক্রিয় সদস্য। নাজিমদ্দিন রিকশা চালক, আলেপ ছাগল চোর নামে পরিচিত। আর জয়েনদ্দিন প্রামানিক একজন পাকিস্তানপন্থি গ্রাম্য মাদ্রাসা শিক্ষক; কবর খোঁড়ার মতো একটি জনহিতকর ও পুণ্য কাজের সাথে জড়িত।

ইতিমধ্যে জামাত নেতা গোলাম আজমের পরামর্শে রাজাকারদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে এবং পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে চাইনিজ রাইফেল ও এলএমজি বহনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। জয়েনদ্দিন প্রামানিক আরও ৪ জন রাজাকারসহ বাহিরদিয়া লোহার ব্রিজে নিরাপত্তা পাহারার কাজ করে। তবে অনেক সহযোদ্ধা রাজাকার পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী হয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করছে। এর মধ্যে আব্দুর রহমান নিজ হাতে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং মেজর সাহেবকে নিয়ে পালবাড়িতে অপারেশেন করিয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা ইতিমধ্যে অনেক বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, ১০/১২ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং ৫ জন যুবতি মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। জয়েনদ্দিন প্রামানিক রাজাকার হলেও এসব কাজকে পছন্দ করে না এবং পাপের কাজ মনে করে। তাই অনেক সময় সে একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে ওই সব খারাপ ডিউটি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। সে দুদিনে ৪/৫ জন কিশোর যুবককে নির্বিঘ্নে ব্রিজ পার হতে সাহায্য করেছে। এ নিয়ে অন্যান্য রাজাকাররা তাকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখছে; এবং একপর্যায়ে তার সন্দেহজনক কার্যকলাপের খবর কমান্ডার রহমান মোল্লাকে জানিয়ে দিয়েছে।

ফরিদপুর সদর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আজাহার মিয়া এখন কোমরপুরের বাড়িতে থাকেন। পাকিস্তানের দোসর এবং কিছু রাজাকার পাকিস্তানি মেজর ইজাজকে জানিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা রাতের বেলায় আজাহার মিয়ার বাড়িতে গোপন মিটিং করছে এবং আশেপাশের স্থাপনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক গভীর রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এলাকার স্থানীয় কয়েকজন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে আজাহার মিয়ার বাড়িতে আসে। দুটি শোবার ঘরের চারদিকে এলএমজি পজিশন নিয়ে জয়েনদ্দিন প্রামানিককে ঘরের ভেতর ঢুকে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি নিশ্চিত

করতে বলে। জয়েনদ্দিন প্রামানিক একটু গড়িমসি করলে ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজের কিছুটা সন্দেহ হয়। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতির খবর প্রদানকারী রওশন রাজাকারকে ঘরের ভেতর পাঠায়। আজাহার মিয়ার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে সেলিনা রওশনকে চিনতে পেরে উচ্চস্বরে বলে উঠে, 'কেন এত রাতে আপনি ঘরে ঢুকেছেন?' বাইরে থেকে সৈন্যরা মনে করে নিশ্চয়ই ভেতরে মুক্তিযোদ্ধা আছে। ক্যাপ্টেন সাহেব অর্ডার দেয়, **'ফায়ার'**। গুলির আওয়াজ আর উচ্চ চিৎকারে আশেপাশের সবার ঘুম ভেঙে যায়, তবে জীবনের ভয়ে কেউ আর এগিয়ে আসে না। ফজরের আজানের পূর্বেই সব কিছু নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ভোরের পাখিরা যেন ঘুম ভাঙানো ডাক ভুলে যায়। সকালের আধো আলো-অন্ধকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। ঘরের বাইরে গোয়ালে বাঁধা দুটি গরু মরে পড়ে আছে। ভেতরে আজাহার মিয়ার স্ত্রীর রক্তাক্ত লাশের কিমা! তখনো বুকে আগলে আছে এক বছর বয়সের ছেলের প্রাণহীন দেহ। মেঝেতে রক্তের স্রোতে ভাসছে নবন শ্রেণিতে পড়ুয়া রোজীর প্রাণহীন নিথর দেহ। আর দরজার ঠিক সামনে পড়ে আছে রওশন রাজাকারের রক্তাক্ত দেহ, ভেতরের খবর নিয়ে বেরুবার আগেই নিজ প্রভুদের গুলিতে সে প্রাণ দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজের নির্দেশে জয়েনদ্দিন প্রামানিককে ধুলদী ব্রিজ থেকে সরিয়ে স্টেডিয়াম আর্মি ক্যাম্পের বাইরে পাহারায় নিয়োজিত করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়েনদ্দিন রাজাকারের কবর খোঁড়ার নেশার ব্যাপারটি জানতেন। তাই তাকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে। ফরিদপুর স্টেডিয়ামের ক্যাম্পটি আর্মি জল্লাদখানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদেরকে রাজাকার, আলবদর আর শান্তিকমিটির সদস্যের সহযোগিতায় ধরে এনে অমানবিক টর্চার করে অনেককে গুলি করে বা বেয়নেট চার্জে হত্যা করা হতো। তারপর সেই লাশ মাঠের উত্তর দিকের ধানক্ষেতে মাটিচাপা দেওয়া হতো। ইতিমধ্যে শহরের আশেপাশের এলাকা থেকে অনেক যুবতি নারী ও কিশোরী স্কুল কলেজের ছাত্রীদেরকে ধরে এনে পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের অনেকে ধর্ষিতা হয়ে বাড়ি ফিরে আসলেও অনেকের ভাগ্যে কি হয়েছে জানা নেই।

জয়েনদ্দিন প্রামানিক নুতন স্থানে কাজে যোগ দেয়ার দুদিন পরে সকালে একজন হাবিলদার এসে তাকে বলল,–'তুমছে এক নায়া কাম করনা হগা।' 'কি কাজ, স্যার? জয়েনদ্দিন জবাব দেয়।–কাবর খোদনা হগা, নেই সাকোগী? জয়েনদ্দিন একটু চমকে উঠে। তারপর নিচুস্বরে বলে, পারবো

স্যার, তবে আমাকে একা খুঁড়তে দিতে হবে।–'ঠিক হায়, তোমলোক একাভি করেগা'–হাবিলদার সাহেব জয়েনদ্দিনকে আশ্বস্ত করে। জয়েনদ্দিন প্রামানিক মনে মনে একটু খুশিই হয়–অনেকদিন হলো রাজাকারের চাকরি নেওয়ার পর কবর খোঁড়া হয় না। ইতিমধ্যে সে ছোটো বড়ো মিলিয়ে ৯৫টি কবর খুঁড়েছে; আর মাত্র ৫টি কবর খুঁড়তে পারলেই তার এতদিনের আশা পূরণ হবে–অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার জন্য একটি কবর নসিব করবেন। সেদিন জয়েনদ্দিন দুটি কবর খোঁড়ে, পাশাপাশি দুজন তরতাজা যুবককে কোনো গোসল জানাজা ছাড়াই মাটি চাপা দেয়া হয়। জানাজাবিহীন এই দাফনে–জয়েনদ্দিনের মন খারাপ হয়। পরদিন জয়েনদ্দিনকে দিয়ে আরও দুটি কবর খোঁড়ানো হয়। একটি একজন আওয়ামী লীগ নেতা, অন্যটিতে পরানপুর থেকে ধরে আনা একটি হিন্দু মেয়েকে কবর দেয়া হয়। জয়েনদ্দিন কপালে সিঁদুর পড়া মেয়েটির শাড়ির আঁচলে একগোছা চাবি দেখতে পায়। কবরে মাটি দেয়ার সময় তার চোখ অজান্তে অশ্রুসিক্ত হয়। চিন্তা করে এই পাপাচার থেকে কোথাও পালিয়ে যাবে। আবার ভাবে, তার কি দোষ? বরং সে না থাকলে তো লাশগুলোকে আরও আযত্নে মাটি চাপা দেয়া হতো; সে তো তবু কবরে লাশ নামিয়ে দোয়া করেছে। বিকেলবেলা হাবিলদার মোকলেস জয়েনদ্দিনের পিঠে হাত দিয়ে বলে,–তোম লোক আচ্ছা মর্দ হায়, তোম একোলাই চার চার গোর খোদলিয়া! জয়েনদ্দিন একটু 'কেঁপে উত্তর দেয়, হামলোক তো একাজ পছন্দ নেহী করতা হায়। জয়নাল জবাব দেয়।

–কিসলিয়ে পছন্দ নাহিহে? আবার প্রশ্ন করে হাবিলদার মোকলেস।

এ কাজ তো ঠিক নেহী হায়–মুসলমানদেরতো কবর দেয়ার আগে গোসল ও জানাজা হতা হায়।'

–আচ্ছা!

–গম্ভীরভাবে হাবিলদার মোকলেস জয়েনদ্দিনের দিকে তাকায়। জয়েনদ্দিন হাবিলদারের ঘন মোচের আড়ালে এক বক্রহাসির রেখা দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। রাতে ইশার নামাজ শেষে মোনাজাত করে, পরওয়ারদীগার আল্লাহ যেন তাকে মাফ করেন। পরক্ষণেই সে একটু আনন্দিত হয়, আজ তার ৯৯টা কবর খোঁড়া শেষ হয়েছে। আল্লাহর রহমতে আর মাত্র একটি কবর খুঁড়তে পারলেই সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, এত দিনের মনেপ্রাণে লালন করা স্বপ্ন পূর্ণ হবে–আল্লাহর তরফ হতে তার জন্য একটি কবর নাজেল হবে। সেখানে মুনকার-নকির সওয়াল-জবাব করবে না,

কোনো কবরে আজাব হবে না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় আগামীকাল একদিনের ছুটি নিয়ে সকালে সে বাড়ি যাবে। মা-বাপের কবর জিয়ারতসহ দুই ছেলেকে নিয়ে জুম্মার নামাজ পড়বে। বিকেলে ধুলদী হাট থেকে বড়ো একটি মাছ কিনবে এবং সকলকে নিয়ে এক সাথে খাবে। শেষ রাতে স্বপ্নে দেখে তাকে সাদা কাফনের কাপড়ে মুড়ে কবরে নামানো হচ্ছে। একটি বড়ো প্রশস্ত কবর। কোমরপুর মিয়া বাড়ি মসজিদের ইমাম সাহেব জানাজা শেষে মোনাজাত করছে। কবরে মাটি দিয়ে চার কুল পড়ে সবাই বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। তার কবরে দুজন ফেরেশতা প্রবেশ করে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে বলছে, 'জয়েনদ্দিন আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে গেছ। তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালা একটি বরকতময় কবর নাজিল করেছেন। তুমি বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।' কোর্ট মসজিদের আজানে জয়েনদ্দিনের ঘুম ভেঙে যায়, সাথে স্বপ্নটার ঘোর কেটে যায়। জয়েনদ্দিন জামায়াতে ফজর নামাজ পড়ে স্টেডিয়াম ও রাজেন্দ্র কলেজের মধ্য দিয়ে চলমান কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে। স্টেডিয়ামের পূর্ব দিকের বিল্ডিং থেকে কিছু নারী-পুরুষের ক্ষীণ কান্নার শব্দ ভেসে আসে। জয়েনদ্দিন আবার এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, তখনো সূর্য উঠে নাই। কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই চাইনিজ রাইফেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। হাবিলদার মোকলেস এসে জয়েনদ্দিনের দরজায় বুটের আঘাত করে উচ্চস্বরে বলে, তোম লোক আভি নিদ যাতা হায়, জলদি উঠে পড়ো। তুমে আজ দো কাবর খোদনা হোগা। জয়েনদ্দিনের বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। হাবিলদার মোকলেসের নির্দেশে জয়েনদ্দিন তাড়াতাড়ি কোদাল চালিয়ে পাশাপাশি দু'টি কবর খুঁড়ে। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ একবার এসে কবরের অবস্থান দেখে যায়।

– জয়েনদ্দিন তোমারা কাবর তৈয়ার হোচুকায়ে? ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ প্রশ্ন করেন।

– জি স্যার, দো কবর ঠিকঠাক মতো খোঁড়া হতা হায়, জয়েনদ্দিন জবাব দেয়।

– তুমিভি রেডি হো যাতা হায়? আবারও ক্যাপ্টেন ইজাজের প্রশ্ন। কিছুটা চমকে ওয়াজদ্দিন উত্তর দেয়, সব প্রস্তুত ঠিক হায় সাব।

দু'জন লোক টেনে-হিঁচড়ে একটি যুবককে কবরের কাছে নিয়ে আসে। তাদের সহযোগিতায় জয়েনদ্দিন ছেলেটিকে কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দেয়। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন ইজাজ ও হাবিলদার মোকলেস সবকিছু পর্যবেক্ষণ

করে। একটি লাশ তখনো আসতে বাকি। জয়েনদ্দিন হাবিলদার মোকলেসকে প্রশ্ন করে, 'আর একটি লাশ আনতা নেহি হায়?' মোকলেস উত্তর দেয় আজ তো দোসরা লাশ নেহি হায়'। –তাহলে আর একটি কবর কেন স্যার? পার্শ্বে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ একটু মুচকি হেসে উত্তর দেয় 'ওতো তোমহারি কবর হায়'। তোমারা খোদা তোমকো লিয়ে এক কবর ফ্রি দিতা হায়। তখন পূর্বাকাশে একটু রক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। হাবিলদার মোকলেসের হাতের তাক করা রাইফেলের দিকে তাকিয়ে জয়েনদ্দিন প্রামানিকের চোখে কবরের গভীর অন্ধকার নেমে আসে।

আমার বন্ধু কামাল

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস। ভোর বেলাতেই কুমার নদীর গেয়াইন্দা ব্রিজের কাছে অনেক মানুষের ভির জমে গেছে। তখন ভাদ্রের পরে আশ্বিন মাসে নদীর পানি কমে গেলেও বেশ স্রোত। সেই স্রোতেই কচুরিপানার সাথে ভেসে এসেছে ১৬/১৭ বছর বয়েসের একটি ছেলের লাশ। খালি গা, পরনে কালো রঙের প্যান্ট–লম্বা চুলে মুখের কিছু অংশ ঢাকা।

নদীর মধ্যে সেজদারত মুসল্লির মতো হেলে পড়া একটি বাবলার ডালে আটকা পড়েছে লাশটি। আজগর বেপারী নদীর ঘাটে অজু করতে এসে প্রথমে দেখতে পান মানুষের মতো একটা কিছু নদীর স্রোতে ভাসছে। তারপর আস্তে আস্তে মানুষ জমতে থাকে। এর মাঝে লাশের পরিচয় পাওয়া যায়; কে একজন মুখ দেখেই শনাক্ত করে কোমরপুরের আসাদ মিয়ার ছেলে কামাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিকে চাঞ্চল্যকর খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাশ্ববর্তী বৈঠাখালী ও কোমরপুরের অগণিত উৎসুক মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়ে যায়। সবার মুখে একই খবর,–আহারে! রাজপুত্রের মতো ছেলেটিকে এভাবে মেরে ফেলেছে! কামালের মা আসে, বাবা আসে, ভাই বোনেরা আসে; সবার চিৎকার ও কান্নায় চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে যায়।

কামাল আমার বন্ধু, ছোটো বেলার খেলার সাথি। একসাথে স্কুলে পড়েছি। একসাথে ফরিদপুর স্টেডিয়ামে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছি। তখন বয়সে ছোটো ছিলাম বলে দুজনের কেউই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে ভারত যেতে পারিনি। স্বাধীনতার জন্য ওকেও আজ এভাবে জীবন বলি দিতে হলো!

২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা নিরীহ এবং নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক রাতেই হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর বাহিনীর সদস্যদের নির্বিচারে হত্যা করে। পৈশাচিক নির্যাতন ও গণহত্যার জন্য ছাত্র-জনতা, বিশেষ করে ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের লোকজন ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। তারা অনেকেই মফস্বল

শহরে নিজ নিজ এলাকায় যেয়ে আত্মগোপন করে। ঢাকা চিটাগাং ছাড়া অন্যান্য জেলা শহরে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য থাকলেও তারা অনেকটা কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ে এবং কুষ্টিয়াসহ অনেক জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্যরা স্থানীয় জনগণের হাতে বন্দি হয় এবং অনেকে প্রাণ হারায়।

ফরিদপুর তখন মুক্ত প্রায়। সত্তরের নির্বাচনের সময় ফরিদপুরে সেনা সদস্যরা সার্কিট হাউজে ঘাঁটি গাড়লেও বছরের প্রথম দিকে যশোরে চলে যায়। ১৯৭১ সনে আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। উনসত্তরের গণআন্দোলনে বড়ো ভাইদের সাথে আমরাও রাস্তায় মিছিলে যোগ দিয়ে স্লোগান দিয়েছি, **'আইয়ুব মোনায়েম দুই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই'। 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'।** আমাদের কয়েকজন বড়ো ভাই–যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজে পড়তেন, তারা মার্চের শেষ দিকে ফরিদপুর চলে আসেন এবং সবাইকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যৎ গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনায় ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। তাদের সাথে যোগ দেন কিছু অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্য; এবং ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দু-একজন ইপিআর সদস্য। আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু বড়োভাই টেপাখোলার হায়দার হোসেন একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বলেন,–বিকেলে স্টেডিয়ামে এস, কাজ আছে। কথামতো বিকেলে স্টেডিয়ামে গেলাম। হায়দার ভাই কয়েকজনের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবাই বয়সে বড়ো; একজন রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষক সা'দত হোসেন এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছোটো ভাই মোকারম হোসেন। পরবর্তীতে সা'দত স্যার কলেজ জীবনে আমার প্রিয় শিক্ষক হয়েছিলেন। যাহোক, হায়দার ভাই এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন; দেশের ক্রান্তিলগ্নে সেখানে আমাদেরকে অস্ত্র চালনায় ট্রেনিং এবং প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগের কথা বললেন। আরও কয়েকজন বক্তৃতা দিলেন। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত হলো, ফরিদপুর হাইস্কুলের ক্রীড়া কমপ্লেক্স হতে কাঠের রাইফেলগুলো বের করে এনে ট্রেনিং-এর কাজে ব্যবহার করা হবে। পরের রাতেই কয়েকজন ছাত্র স্টোর রুমের তালা ভেঙে ১৫/২০টি কাঠের রাইফেল নিয়ে আসল, এবং পরের দিন বিকেল হতেই ট্রেনিং শুরু হলো।

কামাল আমার ছোটো বেলার বন্ধু–প্রাইমারি স্কুল থেকে। ওর বাবা তখনকার দিনের বড়ো সরকারি কর্মকর্তা। জেলা দলিল রেজিস্ট্রারের সেরেস্তাদার; কোমরপুরের বনেদি মিয়াবাড়ির সন্তান,–আসাদ মিয়া। আষাঢ়ের হলুদ ব্যাঙের মতো গায়ের রং, প্রায় ৬ ফুট উচ্চতার লোকটির একটি

বেমানান ভুঁড়ি; আমরা ভয়ে তার কাছে যেতাম না। সবাই বলত, 'ঘুস খাওয়ার নাই জুড়ি, ঘুসের টাকায় ভূঁড়ি'। কামালের বোনগুলো ছিল অপূর্ব সুন্দরী, বিশেষ করে কলেজ পড়ুয়া বড়ো বোন সাইদা আপার রুপ দেখে শহরের অনেক বড়ো ভাইয়েরা ছিল পাগলপারা। কামালকে তাই সবাই একটু বিশেষ গুরুত্ব দিত এবং আদর করত। ওকে নিয়ে একদিন স্টেডিয়ামে রাইফেল ট্রেনিং-এ গেলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই বড়ো ভাইদের কাছে কামাল বেশ ঘনিষ্ট হয়ে গেল। এর মাঝে বাহিরদিয়ার সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট সাজাহান ছুটিতে বাড়িতে ছিল। তার নেতৃত্বে কোমরপুর হাইস্কুল মাঠে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং শুরু হলে সবার সাথে আমি ও কামাল কয়েকদিনের ট্রেনিং নিলাম।

১৭ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে গোয়ালন্দ হয়ে ফরিদপুরে প্রবেশ করে। সকাল হতেই গোয়ালন্দ ঘাটের দিক হতে মটার শেলের 'গ্রুম গ্রুম' আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। হায়দার ভাই বেলা দশটার দিকে আমাদের বাড়িতে এসে কাঠের রাইফেলটি সরিয়ে ফেলতে বললেন। কোনো কুল কিনারা না ভেবে C&B খুদাই একটি ইট বেঁধে আমাকে দেয়া রাইফেলটি চুপি চুপি আমাদের বাড়ির পাটকুয়ার ভেতরে ফেলে দিলাম।

তখনো উত্তর দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল এবং দূরে সাদা কালো ধোয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। তখন চারদিকে নানা গুজব। কয়েকজন বড়ো ভাই বললেন, –গোয়ালন্দ ফেরি ঘাটে ভীষণ প্রতিরোধ যুদ্ধ হচ্ছে, –পাকিস্তানি গানবোট ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সৈন্য বহনকারী লঞ্চগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এই জন্যই সাদা কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। আমাদের ওই বয়সে কৌতূহলের সীমা থাকে না। আমি আমার প্রিয় সাইকেলটি নিয়ে বড়ো রাস্তা ধরে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা দিলাম। ধুলদী হাট পর্যন্ত যেয়ে বড়ো রাস্তা ছেড়ে গোপালপুরের রাস্তা ধরে কিছুটা গ্রামের মধ্য দিয়ে এগুতে লাগলাম। তখনো গোয়ালন্দ ঘাটের দিক হতে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মেঘমালা হয়ে ভেসে আসছিল। আরও সামনে চণ্ডীপুর পার হতেই মানুষের চিৎকার ও শোরগোল শোনা যাচ্ছিল। কয়েকজন লোক রাজবাড়ি-ফরিদপুর সদর রাস্তা হতে এদিকে দৌড়ে এসে বলল,–মিলিটারিরা এসে পড়েছে এবং আসার পথে তারা রাস্তার দু-পাশের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তখন গ্রামের মসজিদে আসরের নামাজের আজান হচ্ছে। আমি আর সামনে না এগুয়ে দ্রুত সাইকেলটি ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে

চললাম। ধুলদী হয়ে আবারও সদর রাস্তায়। পেছনে অনেক দূর থেকে গাড়ির গড় গড় শব্দ এবং সাথে রাইফেলের গুলির গ্রুম গ্রুম আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। কোমরপুর এসে আবার সরকারি হালুট ধরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। শুনলাম একজন মটর সাইকেলে করে শহরের দিকে যাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, 'সবাই সরে যান; পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে গেছে এবং রাস্তার দুপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।' কে একজন বলল, উনি সদর থানার ওসি ইকরাম সাহেব।

বাড়িতে পৌঁছে আর দাঁড়াতে পারলাম না। দেখি সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে য়েতে প্রস্তুত। কিছুক্ষণের মধ্যে কোমরপুরের দিক হতে গাড়ি ও রাইফেলের গুলির আওয়াজ আরও স্পষ্টভাবে ভেসে আসল। আমাদের বাড়িটি একদম সদর রাস্তার পাশে, কাজেই বাড়ি ছাড়তে হবে। যৎসামান্য কাপড়চোপড় নিয়ে উত্তর দিকে আমরা–বাবা, মা, ভাইয়েরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আশে পাশের সকল বাড়ির লোকজন একইভাবে সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে–মসজিদে আজান নাই–বৈশাখী বৃষ্টিতে মাঠেঘাটে কাঁদা পানি। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, যেন কেয়ামতের আলামত-ইয়া নাফসি–আমাকে বাঁচাও। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না, শুধু সামনে অগ্রসর হচ্ছে। এর মাঝে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। আমার বড়ো ভাবি বাড়ি ছেড়ে কিছুদূর এসে বুঝতে পারেন, তার সদ্য জাত ছেলেটিকে রেখে তাড়াহুড়ো করে চকির ওপর রাখা বালিশ নিয়ে দৌড় দিয়েছেন। আমার মেজো ভাই আবার দৌড়ে বাড়ি ফিরে আমাদের ভাতিজাটিকে নিয়ে আসে। অসুস্থ্য হয়ে অনেকদিন বিছানায় পড়ে থাকা আমার এক চাচিকে তার ছেলেরা পালাক্রমে কাঁধে করে রওয়ানা দেয়। কিন্তু এভাবে চলতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কায় কিছুদুর যেয়ে তাদের মাকে বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সামনে দৌড়ায়।

ফরিদপুর শহরের দিকে অগ্রসরমান পাকিস্তানি বাহিনীর গুলির আওয়াজে মনে হচ্ছিল অগণিত লোক মারা যাচ্ছে। আসলে এগুলো ছিল অনেকটা ফাঁকা গুলি। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, একটা ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ব্যাপারটি সবাই পরে বুঝতে পারে। বৃষ্টি কাঁদাপানির মধ্যে দিয়ে আমরা প্রায় ৩/৪ মাইল গ্রামের ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যরা ফরিদপুর শহরে পৌঁছে গেলে রাতেই আমরা যার যার বাড়িতে ফিরে আসি।

ফরিদপুরে পাকিস্তানি আর্মিরা ঢোকার পরেই যুবক শ্রেণির ছেলেরা, বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা জীবনের ভয়ে এবং দেশ রক্ষার ব্রত নিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে মফস্বল গ্রামে যেয়ে সংগঠিত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নেয়। অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়। কোমরপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম- শোভারামপুর ও বৈঠাখালীর বেশ কয়েকজন যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মেজর আবু তাহের দেওয়ান (টেংরা) এবং সার্জেন্ট ফজলের নেতৃত্বে আশেপাশের কয়েক গ্রামের প্রায় শতখানেক যুবক দেশের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

অক্টোবর নভেম্বরের দিকে সারা দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে এবং দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাম অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা সংঘটিত হয়ে ঘাঁটি স্থাপন করতে থাকে। গোবিন্দপুর এবং খলিলপুর অঞ্চলে কুমার নদীর ওপারে সুলতানপুর, কুঞ্চনগর ও রাজাপুর অঞ্চলে ফয়েজ বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প তৈরি করে। তখন পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে কোনো জুতসই আক্রমণ পরিচালনা করতে না পারলেও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা কিছু পাকিস্তানপন্থি চেয়ারম্যান-মেম্বার এবং শান্তি কমিটির সদস্যদেরকে নাজেহাল করে এমনকি কয়েকজনকে হত্যা করে। কেউ কেউ নাকি এদের কাছে চাঁদা দাবি করছে এবং কাঙ্ক্ষিত চাঁদা না দিলে তাদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আবার এই সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধা তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে অনেক প্রভাবশালী ও নিরপেক্ষ লোককে হত্যা করছে। গোবিন্দপুরের জনপ্রিয় এবং জনদরদি মেম্বার আয়নাল মাতুব্বর এবং চরমাধবদিয়ার কাদের (লাল) বিশ্বাসকে টেংরা বাহিনীর কিছু মুক্তিযোদ্ধা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এতে দু-একজনের মনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি একটা বিরুপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

বড়ো ভাইদের সাথে ট্রেনিং নিয়েও মুক্তিযুদ্ধে না যেতে পেরে মনের মধ্যে অনেক কষ্ট ছিল। কাজেই মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক গ্রাম দূরে ক্যাম্প করেছে শুনে মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল। আমরা কজন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে ক্যাম্পে যাওয়ার একটা মওকা পেয়ে গেলাম। একদিন সকালে বন্ধু কামাল এসে বলল, সুলতানপুরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যেয়ে কিছু জিনিস দিয়ে আসতে হবে; হাইকমান্ড হতে পাঠানো হয়েছে।

খলিলপুর গাঙের পুঁটি মাছের বেশ কদর। হোসেন চাচাকে পটালাম ওই গাঙে মাছ ধরতে যেতে হবে। পরদিন দুটি খ্যাপলাজাল এবং বড়ো খালই নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথে কোমরপুর হতে কামালকে সঙ্গে নিলাম। কামাল একটা ছালার ব্যাগে করে কিছু জিনিস নিয়ে আমার মাছের খালইয়ের মধ্যে রাখল। বেশ ভারী। —কী আছে এতে? গ্রেনেড! কিছুটা চমকে উঠলাম। তবে চুপ করে গেলাম যাতে হোসেন চাচা কিছু বুঝতে না পারেন। গোবিন্দপুরে হোসেন চাচার শ্বশুরবাড়িতে মুড়ি-খেজুর গুড় খেয়ে নদীর দিকে রওয়ানা হলাম। পথে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য চাচাকে জানালে তিনি একটু আশ্চর্য হলেন এবং সাবধানে নদী পার হতে বললেন। কামাল এবং আমি ব্যাগ নিয়ে একজন জেলের নৌকায় নদী পার হলাম। ইতিমধ্যে এক কান্ড হয়ে গেছে; কামাল এবং আমি দুজনেই ঢোলা পাঞ্জাবি পাজামা পরে ছিলাম। গোবিন্দপুর নদীর পাড়ে আসতেই দেখি কিছু দূরের হিন্দু কুলু বাড়ির পুরুষ-মেয়েরা দৌড়ে পালানো শুরু করেছে। ওদের ধারণা, আমরা দুজন বিহারি এবং আমাদের পেছনে হয়তো পাকিস্তানি সৈন্যরা আসছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ওদের ভুল ভাঙাতে হলো। দুদিন আগে পারচর স্কুলের পাশে হিন্দু বাড়িতে ঢুকে বিহারি ও রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সৈন্যরা একজন প্রাইমারি শিক্ষককে হত্যা করেছে এবং সদ্য বিবাহিত একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে।

নদীর ওপারে মাইলখানেক হেঁটেই সুলতানপুরের হাবিব মেম্বারের বাড়ি দেখা গেল। ওই বাড়িতেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। দূর থেকেই আমাদেরকে থামিয়ে দেয়া হলো। কামাল আমাদের পরিচয় এবং ব্যাগের মধ্যে জিনিসের কথা বলতেই দুজনকে সরাসরি কমান্ডার ফয়েজ আহমেদ সুবেদার মেজর আবু তাহের (টেংরা) ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সবাই আমাদেরকে সাহস করে ব্যাগে করে গ্রেনেড আনার জন্য প্রশংসা করলো। ফয়েজ ভাই আমাদের দুজনকে আদরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমাদের এলাকার কথা, ফরিদপুর শহরের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। বিশেষ করে বাহিরদীয়া ব্রিজে কতজন রাজাকার, কীভাবে, কতক্ষণ, পাহারা দিচ্ছে খুটিনাটি জেনে নিলেন। বুঝতে পারলাম অতি শীঘ্রই ওরা এই ব্রিজে অপারেশন চালাবে। এর সাতদিন পরেই এক অমবস্যার রাতে মুক্তিযোদ্ধারা বাহিরদীয়া এবং বারখাদা ব্রিজে বোমা মেরে এবং গ্রেনেড ছুড়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এর পরেও আমরা কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাওয়া-

আসা করি এবং খবরাখবর আদান-প্রদান করি। কোমরপুরে আজাহার মিয়ার বাড়িতে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্মম ও পৈশাচিক অপারেশনের খবর শোনার পরে ওরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। এর পরেই তারা এক গেরিলা অপারেশনে শিবরামপুরে একটা মিলিটারি কনভয়কে আক্রমণ করে সাতজন রাজাকার এবং পাঁচজন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করে।

৬ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্ততানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হয়। মাত্র নয় দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর ইস্ট কমান্ড মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডারের কাছে চরমভাবে পরাজয় বরণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমার্পন করে। সেদিন সন্ধ্যায় ফরিদপুর মহিম হাইস্কুলের মাঠে ফরিদপুরে অবস্থানরত এবং যশোর এলাকা হতে পিছু হটে আসা প্রায় শতেক তিনেক পাকিস্তানি সৈন্য এবং ১০/১২ জন অফিসার ভারতীয় সেনাবাহিনীর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমার্পন করে। সেসময় আমাদের সামনেই একজন বেলুচ রেজিমেন্টের অফিসার পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে নিজের পিস্তল বুকে ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করে। ওইদিন সকালে রাজবাড়ি রাস্তার মোড় এলাকায় যশোর থেকে পালিয়ে আসা বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত পাকিস্তানি অফিসার এবং সৈনিকদের নিকট হতে রাইফেল ও পিস্তল কেড়ে নেওয়া হয়। আমরা বড়ো ভাইদের সাথে সেগুলো মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ফরিদপুর সদর থানায় জমা দেয়ার জন্য এক জায়গায় জমা করি। কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও রাজবাড়ি রাস্তার মোড়ে গাড়িয়াল বাড়িতে জমাকৃত রাইফেলের স্তূপ হতে কয়েকটি রাইফেল কামাল এবং কোমরপুরের লতিফ মোল্লারা নিয়ে যায়।

সদ্য স্বাধীন দেশ। একটি বিরাট ঘূর্ণিঝড়ের পরে সবকিছু যেমন লন্ডভন্ড হয়ে যায়, দেশের অবস্থাও অনেকটা তাই। চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ, কলকারখানা ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যাংকে টাকা নাই; জমিতে ফসল নাই; গুদামে খাবার মজুদ নাই। ভারত হতে শরণার্থীরা দলে দলে শূন্য হাতে দেশে ফিরছে। তাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, গরু ছাগল-সবকিছুই লুট হয়ে গেছে। খাবার নাই, থাকার জায়গা নাই, পোশাক-আশাক নাই, পকেটে টাকাপয়সা নাই; উপার্জন করার মতো কাজকর্ম নাই। চারদিকে যেন একটা অভাবের হাহাকার। ফরিদপুর অম্বিকা হলে লংগরখানা খোলা হয়েছে। সেখানে প্রতিদিন শত শত ছিন্নমূল পরিবার দুটি রুটির জন্য কামড়াকামড়ি করছে।

বঙ্গবন্ধুর আহবানে মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়েছে। অনেকেই সরকারের আনসার, পুলিশ বাহিনী বা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। অনেকে তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় যোগ দিচ্ছে। সরকার ইতিমধ্যে ৭১ সনের নির্ধারিত মেট্রিক পরীক্ষায় অটো পাশের ঘোষণা দিয়েছেন। বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা এবং মুজিব বাহিনীর সদস্যরা তাদের কাছে থাকা অস্ত্র জমা দিলেও কিছু কিছু লোক অসৎ উদ্দেশ্যে তাদের হাতে কিছু অস্ত্র রেখে দেয়। এবং পরবর্তীতে এই অস্ত্র ব্যবহার করে বা ভাড়া দিয়ে তারা দেশের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির মতো অপকর্মে লিপ্ত হয়।

আমার বন্ধু কামালও একটি দুষ্ট চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কোমরপুর, বৈঠাখালী, শোভারামপুর অঞ্চলের কিছু আসল এবং ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের অঞ্চলে গুন্ডামি, দস্যুবৃত্তি এবং ডাকাতি শুরু করে। ফরিদপুর শহর হতে বাড়ি ফেরা অনেক মানুষকে ওরা রাস্তার মধ্যে আটকিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। কানাইপুর ও টেপাখোলা গরুর হাট হতে ফেরত গেরস্ত ও মহাজনের কাছ থেকে টাকা পয়সা সর্বস্ব কেড়ে নেয়। ধুলদী, কানাইপুর ও বসন্তপুর হাট-বাজারে ব্যাপক আকারে চাঁদাবাজি শুরু হয়। ইতিমধ্যে এই তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা ডাকাত বাহিনীর হাতে বেশ কয়েকজন দেশপ্রেমিক লোক প্রাণ হারায়। মানুষজন আতঙ্কে রাতে ঘুমাতে না পেরে রাত জেগে পাহারা দিতে থাকে। আমরাও পালাক্রমে আমাদের এলাকায় রাতে পাহারার ব্যবস্থা করেছি।

কিছু বিপদগামী সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এলাকার কুখ্যাত চোর ডাকাতরাও যোগ দিয়েছে। এমনকি জামাত ও মুসলিমলীগের অর্থায়নে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী কিছু যুবক ছেলে দেশ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে নিয়োজিত হয়েছে। আলীপুরের রাজাকার নেতা হান্নান হাফেজের সাথে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী যোগ দিয়েছে। তাদের হাতে সোভারামপুরে দুজন এবং রঘুনন্দনপুরে একজন খুন হয়েছে। আঙিনা ব্রিজের কাছে সন্ধ্যাকালে রিকশায় করে যাওয়ার সময় এক মহিলার গলায় ছুরি চালিয়ে সোনার গহনা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ওয়ার্লেস মোড়ে দুবৃত্তরা এক মুক্তিযোদ্ধাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

সারা দেশেই ক্রমান্বয়ে আইনশৃঙ্ক্ষলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত অবৈধ অস্ত্রে দেশ ছেয়ে গেছে। ব্যক্তিগত লোভ এবং স্বার্থের

আকর্ষণে মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার এবং পেশাদারি খুনি-ডাকাতরা আজ এক হয়ে গেছে। এর মাঝে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধুয়া তুলে জাসদের অগণিত তরুণ দেশের আইনশৃঙ্ক্ষলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তাছাড়া **'কেউ খাবে তো–কেউ খাবে না–তা হবে না, তা হবে না'**–স্লোগান তুলে সর্বহারা পার্টির অস্ত্রধারীরা খুনখারাবি করে, পুলিশের ওপর হামলা করে এবং থানা আক্রমণ করে দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্ক্ষলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। পাকিস্তানি পরাজিত শত্রু এবং তাদের দোসররা কৃত্রিম অভাব এবং মানুষের মাঝে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে প্রমাণ করতে চাচ্ছে 'পাকিস্তানই ভালো ছিল'। তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন- যারা বাংলাদেশ জন্মের বিরোধী ছিল, তারা নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সদ্য প্রসূত বাংলাদেশকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে।

সারা দেশে বয়ে যাওয়া লু হাওয়া আমাদের এখানেও লেগেছে। প্রায় প্রতিদিনই গ্রামাঞ্চলে খুনাখুনি ও চুরি-ডাকাতির খবর শোনা যাচ্ছে। এই অঞ্চলে কামাল বাহিনীর নামে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কামাল কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথেও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যাচ্ছে, কামাল এবং কোমরপুরের আরও একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্ত্রাসীদের কাছে অস্ত্র ভাড়া দিয়ে দেদারসে অর্থ কামাচ্ছে।

কামাল আমার বন্ধু। কামালের এক চাচা আমার একসময়ের শিক্ষক; আমাকে বললেন, আমি যেন কামালকে বলে কয়ে এই খারাপ পথ হতে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি। সে মোতাবেক আমি একদিন সকালে কামালদের বাড়িতে গেলাম এবং ভাগ্যক্রমে ওকে বাড়িতে পেয়ে গেলাম। কামালের মা আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, কেন তোমরা মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিয়ে ছিলে? এই ট্রেনিং না নিলে আমার ছেলেটি এভাবে নষ্ট হয়ে যেত না! এই পথ হতে ফিরে আসতে অনুরোধ করলে কামাল বলল, আমার আর এই পথ ত্যাগ করার উপায় নাই। আমি এখন বিরাট একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে জড়িয়ে গেছি, সরে গেলে মরে যাব; ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। বর্তমানে বিভিন্ন খুনখারাবি ও দেশদ্রোহী কাজে ওর সংশ্লিষ্টতার বয়ান শুনে শিহরিত হলাম। সে চকির নিচে গোপন গর্ত হতে তিনটি অস্ত্র এনে আমার সামনে রাখল, সবগুলোই কাটা রাইফেল। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। কামাল বালিশের নিচ থেকে এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে বলল, নে টান। কামালকে এর আগে কখনো

সিগারেট টানতে দেখি নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি একটি নিলাম। আবারও আমি বললাম, তোর দাদার কথা ভেবে, তোর বাবা-চাচাদের কথা ভেবে–তোদের পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে তুই এই জঘন্য পথ পরিত্যাগ কর। কামাল কিছু না বলে সামান্য মাথা-ঘাড় না হেলিয়া নির্বিকারভাবে সামনের টিনের বেড়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুই যা! দেখি কি করা যায়।

এর সাতদিন পরেই নদীতে কামালের বীভৎস লাশ ভেসে উঠল।

কুলসুমের বাসর ঘর

সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে; আবার কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেকে যাচ্ছে। আষাঢ় মাসের পর এবার শ্রাবণ এসেছে সূর্যের মুখে ঘোমটা পড়িয়ে। সকালে প্রায় প্রতিদিনই আকাশের বুক ফুটো করে বৃষ্টি নামছে। দুপুরে একটু বিরতি দিয়ে আবার বিকালে বৃষ্টি। আষাঢ় মাসেই চারদিকের খানাখন্দ পানিতে ভরে গেছে। এখন এই শ্রাবণে অতি বৃষ্টিতে বন্যার পানি কুমার নদীর দুই পাড় উপচিয়ে সিএন্ডবি রাস্তার পাশের খাল দিয়ে খড়স্রোতা বেগে প্রবাহিত হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে। সোভারামপুর গ্রামটি অম্বিকাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বেশ বড়ো একটি গ্রাম। পল্লি কবি জসিমুদ্দিনের পৈত্রিক বাড়ি এই গ্রামেই। গ্রামের একটি দিক শহরের আলীপুর সংলগ্ন শহরে দ্বীপ; অন্য দিকটি চরের দিকে–প্রকৃত গ্রামের আটপৌরে বৈচিত্র্যতা। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বর্ষার খরস্রোতা কুমার নদী। চারদিকেই আতঙ্ক। সন্ধ্যা হলেই গ্রামটিতে নেমে আসে কবরের নিস্তব্ধতা। শ্মশান ঘাট পার হলেই অম্বিকাপুর ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস; আর আট আনা রিকশা ভাড়া দিলেই শহর লাগন আলীপুর গোরস্থান। বিকেলের সূর্য ঢলে পড়ার পরেই এই রাস্তা দিয়ে লোকজনের চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; তারপর রাতের নিস্তব্দতা ভেঙে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। শহরের যুবক ছেলেদের প্রায় সবাই পাকিস্তানি আর্মিদের অত্যাচারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কেউ কেউ মে-জুন মাসেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ভারত চলে গেছে। কয়েকদিন হলো শহরের অবস্থা খুবই গরম। গত সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা শহরের চৌড়ঙ্গী মোড়ের পানির ট্যাংকে বোমা মেরেছে এবং দিন দুপুরে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ফরিদপুর জিলাস্কুলের একাডেমিক বিল্ডিংয়ের পেছনের ড্রেনে গ্রেনেড ছুঁড়েছে। তারপর থেকেই ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। স্থানীয় রাজাকার আলবদর বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানিসেনারা নতুন করে শহরের বাইরে গোয়ালচামট, ধুলদী ও বদরপুরে হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। শহরের বিহারি পাড়ায় অনেক

বাঙালি তরুণদের ধরে এনে অত্যাচার করে, বেয়নেট খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। রঘুনন্দনপুরের ময়লাগারীতে গত দুই তিন সপ্তাহে প্রায় শতেকখানেক মৃত দেহ ফেলা হয়েছে, কোনো সৎকার করারও সুযোগ দেয়া হয়নি। ময়লাগারীতে মান্দার গাছের ডালে ডালে অনেক শকুন বসে থাকতেই বুঝা যায়, পরম অযত্নে ফেলে দেয়া মৃতদেহগুলো ভক্ষণ করেই ওদের উদর পূর্তি হচ্ছে।

অম্বিকাপুর শ্মশান ঘাট পার হলেই জয়নদ্দিন শেখের বাড়ি। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর চাকুরির সুবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী ও কোয়েটায় কেটেছে তার জীবনের প্রায় ১৫টি বছর। পিতা সোবান শেখের অকাল মৃত্যুতে জয়নদ্দিন শেখের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অষ্টম শ্রেণি পাশ জয়নদ্দিন বিমান বাহিনীতে বিমানসেনা হিসেবে চাকরিতে জয়েন করে ভাষা আন্দোলনের পরের বছর। সাত বছর চাকুরি করে কর্পোরাল এবং বারো বছরেই সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি হয়। জয়নদ্দিন আমেরিকার তৈরি এফ-৮৬ যুদ্ধ বিমান রক্ষণাবেক্ষণে দারুণ দক্ষতা অর্জন করাতে বিমানবাহিনী প্রধানের প্রশংসা সার্টিফিকেট পায়। ১৯৬৫ সালে করাচীর মাসরোর ঘাঁটিতে কর্মরত অবস্থায় সে ভারতের যুদ্ধ বিমান হতে ছোড়া রকেটে মারাত্মকভাবে আহত হয়; এবং একপর্যায়ে তার ডান হাত কেটে ফেলতে হয়। এর দুই বছর পরে মেডিকেল গ্রাউন্ডে সার্জেন্ট জয়নদ্দিনকে অকালীন অবসরে পাঠানো হয়। জয়নদ্দিন বাঙালি বলে পশ্চিম পাকিস্তানে তাকে কোনো সার্ভিস কোয়র্টার দেয়া হয়নি। তাই তার বউ ও দুই মেয়ে গ্রামের বাড়িতেই অবস্থান করে। জয়নদ্দিনও অকালীন অবসর পেয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসে এবং পেনশনের পাওয়া টাকা দিয়ে ফরিদপুর আজম মার্কেটে একটি এক কামরার স্পেস নিয়ে ছোটো বাচ্চাদের পোশাকের দোকান দেয়। বড়ো মেয়ে কুলসুমের জন্ম ১৯৫৭ সালে এবং ছোটো মেয়ে জোহরার ১৯৬২ সালে। ১৯৭১ এর উত্তাল দিনগুলোতে জয়নদ্দিনের দিনকাল ভালো যাচ্ছিল না। কয়েকমাস হলো আজম মার্কেটের দোকানটি বন্ধ। চারদিকে ভয় ও আতঙ্ক। পাকিস্তানি আর্মি এবং স্থানীয় রাজাকারদের অত্যাচারে জয়নদ্দিনের রক্তের মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। একটি হাত না থাকলেও অন্য হাতের মুষ্টি শক্ত হয় প্রতিশোধ নিতে। বড়ো মেয়ে কুলসুম ইশান স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী; জোহরা স্থানীয় সরকারি প্রাইমারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে বলে চারদিকে কানাঘুষো। স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতাদের নির্দেশে বড়ো মেয়েকে স্কুল পাঠাতে বাধ্য করা হচ্ছে। ওই স্কুলের

ছাত্রী মনি সাহার মেয়েকে পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর বেইজ্জতি করার পরে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। জয়নদ্দিন এবং তার স্ত্রীর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। লতার মতো বেড়ে ওঠা মেয়েটির প্রতি নরপিচাশদের নজর পড়লে আর রক্ষা নাই। খাঁ পাড়ার ছাদেক রাজাকার এসে সেদিন হুমকি দিয়ে গেছে। জয়নদ্দিনের বাড়িতে নাকি মুক্তিযোদ্ধারা এসে মিটিং করে এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে রাতে শহরে চোরাগোপ্তা হামলা করছে। ছাদেক খাঁ হুমকি দেয়, মেজর ইয়াজকে সব খবর বলে দেবে। তবে, সে একটি শর্ত দেয়; কুলসুমকে তার সাথে বিয়ে দিলে সে সবকিছু গোপন রাখবে।

– তা কি করে হয়? আমার পরির মতো সুন্দরি কচি মেয়েটিকে তোমার মতো রাজাকারের সাথে বিয়ে দেবার প্রশ্নই আসে না, জয়নদ্দিন দৃঢ়তার সাথে উত্তর দেয়। কুলসুম ও তার মা এক অজানা ভয়ে রাত কাটায়। ছাদেক রাজাকার শাসিয়ে যায়, –ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব কীভাবে আপনার মেয়ে নিরাপদে স্কুলে যায়!

জয়নদ্দিন বড়ো চিন্তায় পড়ে যায়। এসকল নরপশুদের ওপর কোনো ভরসা নাই। রাতে স্ত্রী সালেহা বেগমের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেয়, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিমানবাহিনীতে চাকুরিকালীন একই এন্ট্রির গোয়ালন্দ উজানচরের ওয়ারেন্ট অফিসার তাজুলের ছেলের সাথে মেয়ে কুলসুমের বিয়ে দেবেন বলে পাকিস্তানের কোয়েটা বিমান ঘাঁটিতে বসে দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাজুলের একমাত্র ছেলে সোলেমান এখন রাজবাড়ি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে; এবং কলেজ বিল্ডিং-এ পাকিস্তানি আর্মিরা অফিস বানিয়েছে। সোলেমান তার তিন চারজন বন্ধুদের নিয়ে যমুনার ওপারে কালিহাতিতে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরেই মক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ওরা ভারতে না যেয়ে দেশের মধ্যে থেকেই গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছে। জয়নদ্দিন কোনোরুপ বিলম্ব না করে সন্ধ্যার পরে নদীপথে রওয়ানা হয়। গোয়ালন্দ হতে পায়ে হেটে ও রিকশা ভ্যানে উজানচরে পৌছে। রাতেই বন্ধু তাজুল ও তার স্ত্রীর কাছে সবকিছু খুলে বলে। তাজুল কুলসুমকে ছেলের বউ করে আনতে রাজী হয়ে যায়। দুদিন পরে ছেলে বাড়িতে ফিরলে তার মা সবকিছু বলে ছেলেকে বিয়েতে রাজি করাতে চেষ্টা করে।

– আগে দেশটা স্বাধীন হতে দাও মা; তারপর এসব ঝামেলা করো, সোলেমান উত্তর দেয়। এবার বাবা-মা দুজনেই সোলেমানকে বোঝায়, এই

বিয়েটা এখন না হলে, বাবা তোমার জয়নদ্দিন চাচার মেয়েটিকে নিয়ে মহা বিপদে পড়ে যাবে। তাছাড়া, কুলসুম মাকে তো আমরা অনেক আগে থেকেই তোমার বউ করে আনবার কথা দিয়েছি। অবশেষে মা-বাবার পীড়াপীড়িতে সোলেমান বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে জয়নদ্দিন ও তাজুল পরিবার পরবর্তী শুক্রবার বিয়ের দিন ঠিক করে। সিদ্ধান্ত হয়, বিয়েতে কোনো ঢাকঢোল পিটানো হবে না। গোপনীয়তার সাথে সবকিছু করতে হবে; যতে ছাদেক খাঁ বা তার সাঙ্গপাঙ্গরা কোনো কিছু টের না পায়।

ভাদ্রমাস শেষে আশ্বিণের আবির্ভাব হয়েছে। আশ্বিণ মাসে যে চাঁদ উঠেছে তার সপ্তম হতে দশমিতে দূর্গাপূজা; অথচ এবার এদেশে কোনো পূজার আয়োজন নাই। সনাতন ধর্মের প্রায় সবাই প্রতিবেশী দেশ ভারতে শরণার্থী হয়ে গেছে, অথবা মফস্বল গ্রাম্য এলাকায় যেয়ে কোনো রকমে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আশ্বিন মাসের ৩ তারিখ, চারদিকে অমবস্যার অন্ধকার। রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে একটি বজরা নৌকা শেখ বাড়ির ঘাটে ভেড়ে। তাজুল তার ছেলে সোলেমান এবং ৮/১০ জন নিকট আত্মীয়দের নিয়ে জয়নদ্দিনের বাড়িতে আসে। বরের জন্য কোনো গেট নাই, কোনো ফিতা কাটাকাটি নাই। রাতের সাদামাটা খাবার; সালেহা বেগম সরবত ও ঘরে তৈরি চিনির পায়েস দিয়ে নতুন জামাইকে বরণ করেন। আগে না জানালেও জয়নদ্দিন তার চাচাত ভাইদের এবং বৃদ্ধ মামাকে ডেকে এনেছে বিয়ের মজলিসে। আলিপুর মসজিদের ইমাম খবির উদ্দিন মুন্সীকে বিয়ে পড়াতে ডেকে আনা হয়েছে গোপনীয়তার সাথে। পাঁচ হাজার টাকায় দেনমোহর স্থির করে বিয়ে পড়ানো হয়। ইমাম সাহেবের সাথে উপস্থিত সবাই মোনাজাতে অংশ নেয়। আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রাতেই বউ ছেলেকে নিয়ে উজানচরে নিজের বাড়িতে ফিরবে তাজুল। কিন্তু খবর আসে সন্ধ্যায় গোয়ালন্দ ফেরিঘাটে একটি স্টিমারে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড মেরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ফলে পাকিস্তানি সেনারা রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর লোকদের নিয়ে স্থানীয় শান্তিকমিটির সহযোগিতায় বাড়ি বাড়ি তরুণ যুবকদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। ওরা বাজারের মুদি দোকানগুলোতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কাজেই দুই বেয়াই সিদ্ধান্ত নেয় রাতে আর উজানচরে রওয়ানা হওয়া যাবে না। তাই কুলসুম আর সোলেমানের বাসর রাত তাজুলের বাড়িতেই হবে।

তাড়াহুড়ো করে কুলসুমের ঘরটিতেই কোনোরকমে বাসর সাজানো হয়। কুলসুমের চাচাতো ভাইয়ের বউ রাত ১২টার দিকে হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে কুলসুম ও সোলেমানকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শিকল দিয়ে দেয়। বরযাত্রীদের কাছারি ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে জয়নদ্দিন ও তাজুল দুজনে বাড়ির উঠোনে বকুল গাছ তলায় বাশের পাটাতনের ওপর বসে মৃদস্বরে গল্প শুরু করে দেয়। উদ্দেশ্য নবদম্পতিকে বাহির হতে পাহারা দেয়া। দুই বন্ধু একসময় সেই পুরোনো দিনের পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কর্মরত দিনগুলোর নানা স্মৃতিচারণ করতে থাকে। মাত্র ষোলো বছর বয়সে ক্লাস এইট পাশ করার পরে বিমান বাহিনীতে নাম লেখানো, করাচীর ট্রেনিং ক্যাম্প। তারপর দীর্ঘ ২০/২৫ বছর বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করা, কত কথা-কত স্মৃতি!

চারদিকে নিঝুম অন্ধকার, কিছুক্ষণ আগেই ফরিদপুর হতে রাজবাড়ির শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে। দূরে রেল লাইনের ধারে শেয়ালের ডাক শুনা যাচ্ছে। অম্বিকাপুর ব্রিজের দিক হতে মাঝে মাঝে একটি ডাহুক ডেকে যাচ্ছে। সোলেমান নববধূ কুলসুমকে কাছে টেনে নেয়। চুপি চুপি বলে,–এসো, আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি; আমাদের মিলন যেন সুখের হয়। কুলসুম লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আরও কাছে এসে সোলেমানের বুকে মাথা গুঁজে দেয়। সোলেমান হারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দেয়।

হঠাৎ বাইরে শোরগোল শুনে বকুল গাছ তলায় তন্দ্রাগত জয়নদ্দিন ও তাজুল জেগে উঠে লাফিয়ে নিচে নামে। সামনেই যেন ভূত দেখে। রাজাকার সাদেক খাঁ, সাথে বন্দুক হাতে আরও দুই জন যুবক, গায়ে খাকি পোশাক। টর্চ লাইটের আলোতে জয়নদ্দিনকে দেখেই সাদেক খাঁ চিৎকার দিয়ে বলে, 'তুমি আমার সাথে কুলসুমকে বিয়ে না দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা পোলার সাথে বিয়ে দিলে! দেখাচ্ছি মজাটা।' ইমাম খবির উদ্দিন মুন্সীর কাছেই বিয়ের খবরটা পেয়েছিল সাদেক খাঁ। খবর পেয়েই আলিপুর গোলপুকুর ব্রিজে পাহারারত দুই রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে জয়নদ্দিনের বাড়িতে আগমন।

সাদেক খাঁ জয়নদ্দিন ও তাজুলকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। বাইরে আওয়াজ পেয়ে কুলসুম ভয়ে স্বামীকে জোরে আকড়ে ধরে। সাদেক খাঁ নবদম্পত্তির বাসর ঘরের দরজায় লাথি মেরে হুংকার দিয়ে বলে, 'দরজা খোল, তা নাহলে কিন্তু গুলি করে দেব'। সোলেমান বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দেয়। কুলসুম দরজার আড়ালে শরীর ঢাকে। ঘরে ঢুকেই সাদেক খাঁ

সোলেমানকে মাথার চুল ধরে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে যায়; কুলসুমের মা সাদেক খাঁর পায়ে পড়ে কাকুতি মিনতি করে।–বাবারে, তোমরা এই ছেলেটিকে মেরো না।–এই কেওটের বাচ্চা মুক্তিকে মারবো না তো ছেড়ে দেবো? আবার সাদেক খাঁর চিৎকার। সঙ্গের রাজাকার দুজন রাইফেল তাক করে। সাদেক খাঁ সোলেমানকে পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে ঘাটের দিকে নিয়ে যায়। সারা বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়।–কুলসুমও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সাদেক খাঁ ও তার সঙ্গী রাজাকাররা যে নৌকায় করে এসেছিল, সেই নৌকাতেই সোলেমানকে নিয়ে রওয়ানা দেয়। যাবার সময় সবাইকে হুমকি দেয়; 'আগামী মাসেই সে কুলসুমকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে।'

সবার চোখের সামনেই সোলেমানকে নিয়ে ওরা অম্বিকাপুর রেল ব্রিজের দিকে চলে যায়। তখনো ভোরের আজানের অনেক বাকি; ওদিক থেকে পরপর কয়েকবার গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়–সাথে আত্মচিৎকার। কুলসুম ভয়ে আতঙ্কে বেহুঁশ হয়ে যায়। অতঃপর মুখে ও মাথায় পানি ঢালাতে চোখ খুলে এবং নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। তাকে সাজানো বাসর ঘরেই ঘুম পাড়ানো হয়। ফজরের আজানের সাথে কুলসুমের মায়ের তীব্র চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে যায়। সবাই কুলসুমের বাসর ঘরের দিকে দৌড় দেয়। টিনের ঘরের সুপারি গাছের আড়ার সাথে কলসুমের শাড়িতে ঝুলন্ত লাশ দেখে সকলে নির্বাক হয়ে যায়।

সোবান মৌলানার ভীমরতি

১৯৭১ সাল, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ। ২৫ মার্চ কালো রাতে ঢাকাতে ক্রাক ডাউনের পরে প্রায় প্রতিটি জেলা শহরে পাকিস্তানি মিলিটারি ফোর্স পৌঁছে গেছে। সব জায়গাতেই জ্বালাও পোড়াও এর মাধ্যমে বাড়িঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মালয় সবকিছু ধ্বংস করেছে; এবং ছাত্র-জনতা বিশেষ করে হিন্দুধর্মালম্বীদের হত্যা করে চারদিকে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আরিচা-গোয়ালন্দ হয়ে স্টিমার ও গানবোটে করে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১৭ই এপ্রিল ফরিদপুর শহরে ঢুকেছে। আসার পথে সদর রাস্তার দুপাশের অগনিত বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। শহরে ঢোকার মুহূর্তে জগবন্ধু আঙ্গিনায় অর্চনারত ১১ জন সাধু সন্ন্যাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে; এবং পরদিন কানাইপুর জমিদার বাড়িতে ছোটো বড়ো মিলিয়ে ১৭ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোককে হত্যা করেছে। এ ছাড়া শহরের লক্ষ্মীপুর, আলীপুর, ভাজনডাঙ্গা, ব্রাহ্মণকান্দা ও টেপাখোলার হরিসভাতে বাড়িবাড়ি হানা দিয়ে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের লোকজন, বিশেষ করে হিন্দুদেরকে হত্যা করেছে। ইতিমধ্যে জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন হাটবাজার এবং গ্রামগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদেরকে নিয়ে অপারেশনে নামছে। শহর এবং পাশ্ববর্তী গ্রামের হিন্দুরা বাড়িঘর ছেড়ে খালিহাতে জীবন বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ফেলে যাওয়া অর্থসম্পদ, গবাদিপশু-এমনকি বাড়ির আসবাবপত্র এবং দরজা জানালা পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থিরা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের আপদে বিপদে এগিয়ে আসত। আজকে তারাই পরস্পর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। চারদিকে মানবতার চরম অবক্ষয় ও অবমাননা সামাজিক সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতার বন্ধনকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

রাজবাড়ি রাস্তার মোড়। ঢাকা-ফরিদপুর-যশোর হাইওয়ে রোডের সংযোগস্থল। ফরিদপুর শহরের জিরো পয়েন্ট হতে ৫ কিলোমিটার দুরত্ব। রাজবাড়ি রাস্তার মোড়টি বাক্ষণকান্দা মৌজায় অবস্থিত, এই মোড়ের পার্শ্বেই সরকারি মূকবধির বিদ্যালয়। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রায় শতেক খানেক বোবা-কালা (বয়রা) ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়াশুনা করে। সামনে দোতলা একাডেমিক ভবন এবং পেছনে আর একটি দোতলা ভবন; যার উপরে ছাত্রদের এবং নিচে ছাত্রীদের আবাসিক হোস্টেল। প্রায় সাতফুট দেওয়াল ঘেরা স্কুলটির পেছনে এবং পশ্চিম দিকে ফসলের মাঠ, পূর্বে সরকারি পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং সদর গেটের সামনেই তিন রাস্তার মোড়। ফরিদপুরে মিলিটারি আসার পরে এই স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা চলে গেলেও শিক্ষক কর্মচারীরা নিয়মিত অফিস করছেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। চারদিকে প্রায় জনমানবহীন পরিবেশ। দুদিন আগে বদরপুরের ৮/১০টি হিন্দু বাড়িতে লুটপাট হয়েছে। ওই সকল বাড়িঘরের লোকজন আগেই অন্যত্র চলে গিয়েছিল। সকাল ৯টার দিকে মূকবধির বিদ্যালয়ে একটা শোরগোল শোনা গেল। ভেতরে নাকি ডাকাত পড়েছে। স্কুলের দপ্তরি জয়নাল এবং শিক্ষক সোবান মৌলানা দুটি ১৬/১৭ বছরের ছেলেকে পাকড়াও করে গেটের কাছে নিয়ে এসেছে। এরা নাকি ছাত্রাবাসের দরজা ভেঙে ভেতরে ছাত্রদের জিনিসপত্র লুট করছিল। ছেলে দুটকে যথেষ্ট উত্তম-মধ্যম দেয়া হয়েছে। এক জনের ডান হাতের কবজি ফেটে রক্ত বের হচ্ছে; অন্যজনের নাক-মুখ ফুলে গেছে। দুজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে স্কুলের গেটের সামনে বড়ো রাস্তার পাশে নিয়ে আসা হয়েছে। চারদিক হতে অনেক উৎসাহী লোকজন এসে ভিড় করে বেশ একটা জটলা পাকিয়েছে। ছেলে দুটি চিৎকার করে বলছে, আমরা চোর নই, আমরা শুধু রুমে ঢুকে ঘুমিয়ে ছিলাম। তারা নিজেদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করছে। একপর্যায়ে স্কুলের আবাসিক হেড মাস্টার আজহার সাহেব এবং পাশের মসজিদের ইমাম ওলেউল মুন্সী ছেলে দুটোকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেও মৌলনা সোবান মাস্টার বেঁকে বসেন। তিনি এদেরকে মিলিটারিদের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবে স্থানীয় মণ্ডলবাড়ির লোকজনও উৎসাহ দান করে।

এমন সময় রাজবাড়ির দিক হতে একটি গাড়ি আসতে দেখা যায়। কাছে আসতেই দেখা গেল এটা একটি মিলিটারি জিপ। গাড়িটি থামিয়ে একজন

জুনিয়ার অফিসার এবং ৩/৪ জন খাকি পোশাকের সৈন্য নেমে আসে। ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের অফিসার কাছে এসে হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করে 'এহাপার কাহেকা গ্যাঞ্জাম চলায়াহো?' মৌলনা সোবান বলেন, 'স্যার এ দু আদমি মুক্তি হায়। এ আদমী স্কুলসে লুট করলিয়া'। ক্যাপ্টেন সাহেব ভ্রু কুচকে বলেন, এদেরকে শাস্তি দিতে হবে। তিনি মৌলানা সাহেবকে বলেন, এক চাকু লেকার আও। সোবান মাস্টার তাড়াতাড়ি স্কুলের দিকে দৌড় দেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একটি তরকারি কাটার বটি নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন এজাজ মৌলনা সোবানকে ওই বটি দিয়ে দুজনকে গলা কেটে কতল করতে বলেন। মৌলনা সোবান একথায় ইতস্তত করতে থাকে এবং ভয়ে কিছুটা কাঁপতে থাকে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে দুজন সৈন্য তার বুকে বন্দুক তাক করে চিৎকার করে বলে, –শুয়ারকা বাচ্চা! তোম লোক কাহাছে হুকুম তামিল করাতে নেহি? মৌলনা সোবান ভয়ে কুঁকড়ে যায় এবং আল্লাহ আকবর বলে একজনের গলায় বটির পোচ দেয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়–ছেলেটি ইয়া আল্লাহ! বলে চিৎকার দেয়। জটলা পাকানো মানুষজন ভয়ে দিগ্‌বিদিক দৌড় দেয়। সৈনিকদের বন্দুকের নলের সামনে মৌলনা সাহেব দ্বিতীয় ছেলেটিকেও একইভাবে জবাই করে। লাশ দুটোকে পাকিস্তানি আর্মির নির্দেশে বিনা জানাজায় বিনা কাফনে পাশের সিএন্ডবি ইট ভাটায় মাটি চাপা দেয়া হয়। অতঃপর ক্যাপ্টেন সাহেব এবং সৈনিকরা গাড়িতে উঠে শহরের দিকে চলে যায়। মণ্ডলবাড়ির মসজিদে জুম্মার নামাজের আজান পড়ে গেছে। এই হৃদয়বিদারক এবং নিষ্ঠুর ঘটনা চারদিকে দ্রুত আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে। জুম্মার নামাজের পরে মুসল্লিরা এবং পথচারীরা মোড়ে জমায়েত হতে থাকে। সবাই সোবান মৌলানাকে গালিগালাজ করে লানত করতে থাকে। কয়েকজন তার ওপর চড়াও হয়ে কিলঘুসি মারতে থাকে। সোবান মৌলানার সাথে ফরিদপুর শহরের শান্তিকমিটির লোকজনের খাতির থাকায় শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন হওয়ার ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সন্ধ্যার দিকে চারদিকে এক মহা আতঙ্ক নেমে আসে; ফলে মোড়টা একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে কয়েকজন লোক সিএন্ডবি ইটের ভাটায় যেখানে ছেলে দুটাকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল, সেখানে যেয়ে দেখে রাতে শিয়ালে লাশ দুটোকে মাটির নিচ হতে টেনে বের করে অনেকটা ভক্ষণ করেছে। আবারও তাদের দেহাবশেষ মাটি চাপা দেয়। এঘটনা চারদিকে রটনা হয়ে যায় এবং

প্রায় সবাই সোবান মৌলানাকে ধিক্কার দিতে থাকে। সোবান মৌলানা নিজেকে গুটিয়ে নেয়-এমনকি মসজিদে নামাজ পড়া বন্ধ করে দেয়।

এদিকে ধীরে ধীরে ছেলে দুটির পরিচয় উৎঘাটিত হয়। ওদের বাড়ি গোয়ালন্দ মহকুমার খানখানাপুর গ্রামে। শাজাহান এবং আলমগীর দুজন সহোদর ভাই। দুজনই উজানচর হাইস্কুলের ছাত্র; শাজাহান ক্লাস টেনের ছাত্র এবং আলমগীর ক্লাস নাইনের। দুজনের মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই দারুণ ভাব, যেন হরিহর আত্মা। ওদের বাবা ছাদেক মোল্লা বেশ পরহেজগার লোক। তিনি খানখানাপুর বাজার মসজিদে ইমামতি করেন। আশে পাশের গ্রামের লোকেরা তাকে মুন্সীসাব বলে ডাকে এবং গাছের আম, কলা ইত্যাদি মুন্সী সাবকে না খাইয়ে খায় না। ধর্মের প্রতি অনুরাগী হলেও ছাদেক মোল্লা পাকিস্তানপন্থি নয়। অনেক আগে থেকেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত নেতা শেখ মুজিবের ভক্ত। সত্তরের নির্বাচনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান রাজবাড়িতে সভা করতে আসলে ছাদেক মোল্লা সভার শুরুতে কোরআন তেলোওয়াত করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে হাত মুসাফাহা করেন। এ নিয়ে স্থানীয় জামাত নেতারা মসজিদের মুসল্লিদেরকে নিয়ে তাকে একঘরে করার চেষ্টা করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজবাড়ি ঢুকার পরে জামাত মুসলিম লীগের লোকজন জোর করে সাদেক মুন্সিকে খানখানাপুর মসজিদের ইমামতি হতে বাদ দিয়েছে। সাদেক মুন্সীর তিন মেয়ের জন্মের পরে দুই ছেলের জন্ম। পিতার মতো তারা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত এবং পাকিস্তান বিরোধী। ২৬ মার্চ ঢাকাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম আক্রমণের পর হতেই শাজাহান ও আলমগীর তাদের সমবয়সি বন্ধুদের নিয়ে গোয়ালন্দ রক্ষা কমিটিতে যোগ দেয়। গোযালন্দ আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্রলীগ এবং বামপন্থি নেতাকর্মীদের নিয়ে এই প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দুজন ইপিআরের সদস্য এবং পাকিস্তান আর্মির বরখাস্তকৃত একজন সৈনিক এই প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদেরকে শারীরিক কসরত ও রাইফেল ট্রেনিং দেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তানি সেনারা দুটি গানবোর্ড এবং আরিচা ঘাটে বাঁধা ৩টি ফেরি ব্যবহার করে গোয়ালন্দ ঘাটে অবতরণ করে। অতঃপর গোয়ালন্দ ঘাট এবং বাজারের সকল দোকানপাট ফ্লাশগান ও বিস্ফোরক দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। স্টিমার ঘাটে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে যেয়ে গোয়ালন্দ রক্ষা কমিটির সদস্যরা পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে টিকতেই পারে নাই। তাদের মর্টার

শেলের আঘাতে দুজন যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছে। বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে দিকবিদিক দৌড়ে পালিয়েছে।

পাকিস্তানি সৈন্যদের বড়ো অংশই ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হয়; তবে কিছু সৈন্য গোয়ালন্দ ও রাজবাড়ি থেকে যায়। পরদিনই স্থানীয় জামাত ও মুসলিম লীগের নেতারা পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন এমদাদ ও সুবেদার মেজর আরসাদের সাথে দেখা করে এবং এবং তাদের হাতে প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা তুলে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা স্থানীয় অনুচরদের সহায়তায় পাকিস্তান বিরোধী দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করে। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র, দেবগ্রামের আহমদ ইউসুফকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্দেহে আটক করে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে। ছাদেক মোল্লা তার দুটি ছেলে শাজাহান ও আলমগীরকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায়। জামাত নেতা তোরাব মাস্টার এবং সামাদ সরদার এর মাঝেই ছাদেক মোল্লার আগের কৃতিকলাপ নিয়ে শাসিয়ে গেছে,–'তোদের মুজিব বাবাতো ধরা পড়েছে, পাকিস্তান ভাঙার দায়ে তার ফাঁসি হবে। তুই এবং তোর ছেলেরাও বাঁচবি না। তোরা সব ইসলাম এবং পাকিস্তানের দুশমন, শীঘ্রই তোদের শিক্ষা দেওয়া হবে।'

ছাদেক মোল্লা সিদ্ধান্ত নেয়; নিজের যা হাবার হোক না কেন, ছেলে দুটোকে রক্ষা করতে হবে। স্ত্রী সালেহা বেগমের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করে; তাদেরকে মকসেদপুরের মহারাজপুর গ্রামে ওদের মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। সে মোতাবেক ওদেরকে ৩০ টাকায় নাজিমদ্দিনের রিকশা ঠিক করে ফরিদপুর পাঠিয়ে দেয়। সিদ্ধান্ত হয় কবিরপুরে ফুফুর বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন পায়ে হেঁটে বা রিকশা ভ্যানে নগরকান্দা হয়ে মহারাজপুরে যাবে। কিন্তু ওরা বসন্তপুর, শিবরামপুর ও ধুলদী পাড় হয়ে বাহিরদীয়া ব্রিজে আসতেই সেখানে পাহারারত রাজাকাররা পথ আটকিয়ে দেয়। প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা নানাভাবে হয়রানি ও জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্ধ্যার পরে ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নাজিমদ্দিন রিকশাওয়ালা ইতিমধ্যেই ভয়ে ওদেরকে রেখে চম্পট দিয়েছে। ওরা পায়ে হেঁটেই কবিরপুরের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। রাজবাড়ি রাস্তার মোড়ে এসে ওরা অন্ধকার রাতে গ্রামের পথ খুঁজে না পেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, রাতে এই স্কুলের কোনো একটা রুমে থেকে ভোরে ফুফু বাড়ি রওয়ানা দেবে। সে মোতাবেক দু-ভাই হোস্টেলের একটি খালি রুমের দরজা খুলে কাঠের চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে। সারাদিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া এবং বাহিরদীয়া ব্রিজে

রাজাকারদের মানসিক অত্যাচারে ওরা ভিষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তাই ভোরে ঘুম ভাঙে নাই। তার পরেই নেমে আসে সেই মহা বিপর্যয়। মূকবধির স্কুলের দপ্তরী জয়নাল ওদেরকে দেখে 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। অতঃপর সোবান মৌলানা দু'জনকে ধরে হেডমাস্টার আজহার সাহেবের কাছে নিয়ে যায় এবং ডাকাত বলে মারধর করে। এর পরেই সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে।

দু'দিন পর বোনজামাই কবিরপুরের সামাদ মণ্ডলের কাছে খবর পেয়ে ছাদেক মোল্লা সস্ত্রীক ছুটে আসেন। মানুষের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে কান্নাকাটি করেন এবং একসময় স্ত্রী সালেহা বেগম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তারপরে সিএন্ডবি ভাটায় মাটিচাপা দেওয়া ছেলেদের কবরের ওপর লুটিয়ে পড়েন। ছেলেদের লাশ উঠিয়ে খানখানাপুর নিয়ে যেতে চাইলে স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে মণ্ডলবাড়ি মসজিদের ইমাম সাহেব বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন। ছাদেক মোল্লা ও সামাদ মণ্ডল মসজিদে মিলাদ দিয়ে শাজাহান ও আলমগীরের জন্য দোয়ার ব্যবস্থা করেন। ইমাম সাহেব দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুইজনকে শহিদের মর্যাদা দেয়ার জন্য ফরিয়াদ করেন।

এর দু'দিন পরে আবারও রাজবাড়ি রাস্তার মোড়ে মানুষের জটলা। রঘুনন্দনপুর খ্রিষ্টান পাড়ার সোমেল ভদ্র ও সুনিল গোমেজ খুব ভোরে উঠে খ্যাপলা জাল দিয়ে সিএন্ডবি ভাটার খাদে মাছ ধরতে যায়, তখন চারদিকে অন্ধকার, ফাল্গুনের সকালেও ঘন কুয়াশা।

– সুনিলদা! দেখো না, বাবলা গাছের ডালে মানুষের মতো কি যেন ঝুলছে! সোমেল ভদ্র আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার দেয়। –তাই তো! চল সামনে যেয়ে দেখি। সুনিল গোমেজকে তাড়া দেয়। তারপর দু'জন আস্তে আস্তে ধীরপায়ে সামনে এগুতে থাকে। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। পাঁচদিন আগে দু'টি ছেলেকে যেখানে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল–তার থেকে একটু দূরে বাবলা গাছের ডালে একজন মানুষ ঝুলছে। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পরনে চেক লুঙ্গি এবং মাথায় টুপি। আরও কাছে এসে সোমেল ভদ্র চিৎকার দিয়ে উঠে, আরে এ তো দেখছি বোবা স্কুলের শিক্ষক সোবান মৌলানা!

একজন মুক্তিযোদ্ধার রক্তমাখা ডায়রি

পৌষের শীতের সকাল, প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে। গাছপালা মাঠঘাট সবকিছুই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে। মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে ছামাদকারী সাহেবের গলা কাঁপানো আজান ভেসে আসছে। কিন্তু সবকিছু ছাঁপিয়ে মোল্লাবাড়ি থেকে মেয়ে কণ্ঠে কান্নার রোল শুনা যাচ্ছে। হামেদ মোল্লার এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে একলাস মোল্লা বড়ো। মা বাবার বড়ো আদরের ছেলে একলাস; স্থানীয় কোমরপুর স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। হামেদ মোল্লার জমিজিরাত আছে বেশ। নিজেই রাখাল পৈরাত নিয়ে হালচাষ করেন। জমিতে ধান হয়, পাট হয়; রবিশস্য হিসেবে ছোলামুসুর, মুগ, কালাই এবং মসনে হয়। সারা বছরে ছোটো সংসারে চালডাল নিজের জমি থেকেই আসে। পাট ও ছোলা মসুর বিক্রি করে যে উপরি টাকা আসে, তা দিয়ে সংসার চালানোর পরে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে প্রতি বছর এক আধ বিঘা জমি কিনেন হামেদ মোল্লা। কিন্তু এ বছর সবকিছু বিরাণ হয়ে গেছে। জমিতে পাট বোনা হয়েছিল, সেই পাট জমিতেই রয়ে গেছে। ধানের জমিতে ঠিকমতো নিড়ানি ও সার না দেয়াতে ঘাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ধান মাথা তুলতে পারে নাই। অযত্নে অবহেলায় হালের বলদ দু'টি রোগা কঙ্কালসার হয়ে গেছে।

একলাস তার সহপাঠী বন্ধু পাচ্চরের তোরাব আলী এবং বৈঠাখালীর রজব দেওয়ানকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। প্রথমে ওরা দেশের মধ্যে গড়ে উঠা কাদরিয়া বাহিনীতে নাম লেখালেও জুলাই মাসের প্রথম দিকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরের শিলিগুড়ি পার হয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ের পাদদেশে ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেয়। সেখানে আগে থেকেই পুলিশ, ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ছাত্র যুবকদের প্রায় ৩০০ জন দেশপ্রেমিক বাঙালি ট্রেনিং-এ অংশ নেয়। ভারত সরকার ট্রেনিং ক্যাম্পসমূহে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়া এবং অস্ত্রগোলাবারুদ দিয়ে উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে। একলাস

স্কুলে বয়েস স্কাউটে আগেই কিছুটা ট্রেনিংপ্রাপ্ত বলে মাত্র পনেরো দিনেই দক্ষতার সাথে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং শেষ করে। অতঃপর মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সিলেট সীমান্তে সঙ্গীদের সাথে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেয়।

ছেলের যুদ্ধে যাবার পর হতেই মা আলেকজান খাতুন নানা দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন এবং একপর্যায়ে তার ক্রনিক অম্বলের ব্যথা বেড়ে যায়। গ্রামের অমলেশ কবিরাজ গাছ গাছড়ার ঔষধ দিলেও খুব একটা সুস্থতা ফিরে না। উৎকণ্ঠা ও ভয়ের মাঝে কয়েকটি মাস চলে যায়। ডিসেম্বর মাসে আকাশে যুদ্ধ বিমানের আওয়াজ শুনে একলাসের মা–'কি হয়েছে'? জানতে চায়। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবে বলে হামিদ মোল্লা তার শয্যাশায়ী স্ত্রীকে জানান। এরপর রেডিওতে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আনন্দ উল্লাসের কথা শুনে আলেকজান খাতুনের চোখ আনন্দঅশ্রুতে ভিজে যায়। এতদিন পরে ছেলে ফিরে আসবে। মায়ের মনে সুখের বন্যা। ছেলের প্রিয় খাবার: নারিকেলের পাকান পিঠা, ধুলদী বিলের সরপুঁটি মাছ ভাজা, পরাঙ্গী ধানের গরম মুড়ি–সবকিছু জোগার করতে অসুস্থ শরীরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পালানের মদনা কলা গাছের এক কাইন কলা বাদুড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে মশারির কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ছোটো বোন রোকশানা কাঁচা হাতে ভাইয়ের জন্য ফুল আঁকা রুমাল সেলাই করেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে দেশে ফিরে আসছে। চারদিকে রাইফেল স্টেনগানের গুলির আওয়াজ। কিন্তু এখনো একলাসের খোঁজ নাই। বাবা ভাবছে হয়তো সিলেট বা কুমিল্লা বর্ডার পার হয়ে ঢাকা হয়ে আসতে দেরি হচ্ছে। হয়তোবা একসাথে সহযোদ্ধা বন্ধুদের সাথে আসতে পথে কোথাও আটকা পড়েছে। স্ত্রীর অস্থিরতা উৎকণ্ঠা এবং বার বার জিজ্ঞেস করায় হামিদ মোল্লা তার ভাবনার কথাগুলো বলেই স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

জানুয়ারি মাসের দুই তারিখ। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে যাবেন এমন সময় বাড়ির বাইরের গেটে দু'জন মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।–আপনারা কি জেগে আছেন? এটা কি একলাসদের বাড়ি? হামিদ মোল্লা হারিকেনের সলিতা বাড়িয়ে উঠানের দিকে যান। টিনের গেট টান দিয়ে খুলে দেখতে পান, দু'জন নয়, তিনজন যুবক। মুখ ভরা দাড়ি, উশকোখুশকো চেহারা, গায়ে রংচটা ময়লা জামা। ওরা নিজেদেরকে যুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দেয়। সবার বাড়িই মধুখালী-বোয়ালমারী এলাকায়। সিলেট

সীমান্ত দিয়ে দেশে ঢুকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজই ঢাকা থেকে নৌকাযোগে গোয়ালন্দ ঘাটে এসে, কিছুটা রিকশায় ও কিছুটা হেঁটে এখানে এসেছে। তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে হামিদ মোল্লার মনে আনন্দ ধরে না। ওদের কথা বলার মাঝেই জিজ্ঞেস করেন,

– 'আমার একলাস কই? সে ভালো আছে তো?' ছেলেগুলো নির্বাক নিরব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

– কী হলো? ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? একলাস কোথায় বলো। হামিদ মোল্লা একদমে প্রশ্ন করে। একজন একটু দম নিয়ে কোনো রকমে ঢোক গিলে বলে, চাচা, একলাস আর বেঁচে নাই; সে যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। আমরা সেই খবরটিই দিতে এসেছি।

– কী বললা? আমার একলাস নাই? দেশের জন্য শহিদ হয়েছে! হামিদ মোল্লা উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে একদমে কথাগুলো বলেন। তার হাতে ধরা হারিকেনটি হাত হতে পড়ে যাচ্ছিল। একজন ছেলে তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে বলে, –চাচা, হাল ছেড়ে দেবেন না। ধৈর্য ধরুন। শুধু আপনার ছেলে একলাস নয়; আমাদের দলের চার সহযোদ্ধা বন্ধুদেরকে আমরা হারিয়েছি। তারপর বলল, –সুনামগঞ্জ বর্ডারে গেরিলা যুদ্ধের সময় ২৮ নভেম্বর একলাস পাকিস্তনি সৈন্য এবং স্থানীয় রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে। একলাসের ওপর নির্মমভাবে টর্চার করে বেয়নেট চার্জ করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু আলৌকিকভাবে সে বেঁচে উঠে এবং কোনো রকমে পথ খুঁজে নিকটবর্তী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো যায়নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং ইনফেকশনের জন্য ৩/৪ দিন পরে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সাজ্জাদ নামে একটি ছেলে বলে, সে ওই ক্যাম্পে ছিল। একলাস মৃত্যুর আগে তার হাতে একটি ডায়রির কয়েকটি পাতা দিয়ে বাড়ির ঠিকানা লিখে সেগুলো তার মায়ের হাতে পৌঁছে দিতে বলেছে।

এত রাতে স্বামীর দরজা খুলে বাইরে যাওয়া এবং মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়ায় আলোকজান খাতুন কাজের মেয়ে সাহেরার হাত ধরে গেটের কাছে আসেন। এবং তার কানে ছেলেদের শেষের কথাগুলো ঢুকতেই-'একলাসরে'–বলে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আশে পাশের বাড়ির লোকজন এসে জড়ো হয়। মাথায় পানি দিয়ে, তালপাতার পাখায় বাতাস করে আলোকজান খাতুনের হুঁশ ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু তারপর থেকেই সারারাত একলাসের মা ও বোনের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠে।

ছেলে তিনটি রাতেই চলে গেছে। যাবার আগে সাদা ময়লা কাপড়ে মোড়ানো একলাসের ডায়রির পাতাগুলো তার বাবাকে দিয়ে গেছে। বিকেলের দিকে সবার মনের অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলে হামিদ মোল্লা স্ত্রীর সামনে কাপড়ে মোড়ানো ডায়রিটি খুলে দেখতে বসেন। তারপর ছেলের রক্তে ভেজা পাতাগুলোর প্রতি চোখ বোলান।

প্রথম পাতা

গত ২৮ নভেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের কমান্ডার মোকারম স্যারের নেতৃত্বে আমরা তেরোজন সদ্য ট্রেনিং করা মুক্তিযোদ্ধা মেঘালয়ের শিলং হতে সুনামগঞ্জের ডলুরা বর্ডার অতিক্রম করে বানছারামপুর গ্রামে প্রবেশ করি। আগের প্লান অনুযায়ী আমরা স্থানীয় মেম্বার বাতেন হাজির বাড়িতে উঠি। রাতে মাশকালাই ডালের খিচুড়ির সাথে বেগুন ভাজা এবং আলু ভর্তা–অনেকদিন পর যেন মায়ের হাতের রান্না খেলাম। মোকাররম স্যার আমাদের নির্দেশ দিলেন, শেষ রাতে জাদু কাটান নদীর ওপর নির্মিত কংক্রিটের ব্রিজটি ভেঙে দিতে হবে। ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে আমরা ১২ জন রওয়ানা হলাম। সাজ্জাদের হঠাৎ করে জ্বর আসাতে সে ওই বাড়িতেই রয়ে গেল। অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার। সোজা রাস্তায় না যেয়ে ধানক্ষেতের আইল দিয়ে, আখক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা কোনো রকমে হাতিখোলা ব্রিজের দুইশত গজের মধ্যে পৌঁছালাম। ব্রিজের নিচে পাহাড়ি স্রোত; যদিও পানির গভীরত বেশি নয়। ব্রিজের দুই পাশেই রাজাকারের ক্যাম্প। আগেই রেকি করা হয়েছে, রাতে পালা করে ছয়জন রাজাকার ব্রিজ পাহারা দেয়। পশ্চিম দিকের তাবুতে মিটিমিটি আলো দেখে অনুমান করা হলো, এখন শুধু একদিকে ওরা ডিউটি করছে। আমাদের সহযোদ্ধা আসলাম ও পরিতোষ লুঙ্গি কাছা দিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে নদীতে নেমে গেলো। কোথাও মাজা পানি, কোথাও বুক পানি অতিক্রম করে ওরা ব্রিজের পূর্ব দিকের শেষ পিলারের সাথে দু'টি শক্তিশালী ডিনামাইট বোমা ফিট করে নিরাপদ দূরত্বে চলে এলো।

আমার হাতে দু'টি গ্রেনেড, অন্যরা এসএলআর সহ অন্যান্য অস্ত্র বহন করছে। ঠিক রাত ৩.১০ মিনিটে তারযুক্ত রিমোটের মাধ্যমে বোমার ডেটোনেশন ঘটানো হলো। রাতের নীরবতা ভেঙে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হলো এবং বিরাট শব্দ করে ব্রিজের কংক্রিট গ্লাব ভেঙে পড়ল। রাজাকারেরা বুঝে ওঠার আগেই আমি এবং আলতাব ক্যাম্পে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলাম। আত্মচিৎকার শোনা গেল; ওদের ছুটাছুটির অবস্থায় মোকাররম স্যার এবং অন্য ৪/৫ জন এসএল আর হাতে উপর্যপুরি গুলি করলো। তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করে আমরা পশ্চিম দিকের ধান-পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সকালের আজানের আগেই বাতেন হাজির বাড়িতে ফিরে এলাম। হাত-পা ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে আমরা সবাই বাড়ির ভেতরে ধান চাল রাখার গুদাম ঘরে শুয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় পাতা

সকাল নয়টা-দশটার দিকে প্রচণ্ড শোরগোল শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাতেন হাজি চুপি চুপি এসে বলল, পাশের গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে। গত রাতে ব্রিজ অপারেশনে নাকি ৩ জন রাজাকার নিহত হয়েছে এবং ২ জন আহত হয়েছে। আরও কিছু সময় পর, আমরা সবেমাত্র ছোলার ডাল এবং রুটি দিয়ে নাশতা সেরেছি, বাইরে অনেক লোকের কথার আওয়াজ। বাতেন হাজির কলেজ পড়ুয়া ছেলে ইকবাল রহমান এসে জানাল, বাছের মৌলানার লোকজন ধানক্ষেতে পায়ের দাগ দেখে মিলিটারিদের বলেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী মুক্তিসেনারা এই গ্রামেই লুকিয়ে আছে। পাকিস্তানি আর্মিরা ইতিমধ্যে দূরের ৪/৫ টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাতেন হাজি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, –মহা বিপদ! তোমাদেরকে এখনই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। তা নাহলে ওরা বাড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। মোকাররম স্যার তৎক্ষণাত ডিসিশন নিয়ে ফেললেন। লোকজন যাতে বুঝতে না পারে, আমরা

বাড়ির পেছনের দিকে ধান এবং ঘন আখক্ষেতের ভেতর দিয়ে খালি পায়ে লুঙ্গি পরে মাথায় মাথাইল দিয়ে, টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বর্ডারের দিকে রওয়ানা দিলাম। ধান, পাট এবং ধনেচ্যা খেতের আইল দিয়ে একপর্যায়ে বর্ডারগামী কাঁচারাস্তায় উঠতেই দেখি রাজাকার-আলবদর এবং পাকিস্তানি আর্মিরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। আমরা রাস্তা ক্রলিং করে অপর পাশে খাদের পানির মধ্যে শরীর ডুবিয়ে পজিশন নিলাম। কমান্ডারের নির্দেশে জীবন রক্ষার্থে আমরা ফায়ারিং শুরু করলাম। রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসা কয়েকজন শত্রু সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর একটু নীরবতার পরে পাকিস্তানি সেনারা চাইনিজ রাইফেল এবং গ্রেনেড নিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো। আমার পাশে অবস্থান নেওয়া আসলাম শেখ হঠাৎ মাথায় গুলি খেয়ে নুইয়ে পড়ল। আমি ক্রলিং করে কাছে যেতেই সে বলল, –যা পালা, আমি বিদায় নিচ্ছি। লা-ইলাহা ইল্লাললাহু–বলে সে জ্ঞান হারালো। দ্বীমুখী আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে আমরা পিঁছু হটার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ডানদিকে পজিশন নেওয়া মোকাররম স্যার এবং সাজ্জাদ আলী বিপদজ্জনক অবস্থানে থাকায় সরতে পারছিল না। আমি একটি গ্রেনেড চার্জ করে ওদের কাভারেজ দিলাম যাতে ওরা সরে যেতে পারে। ওরা নিরাপদে সরে যেতে পারলেও আমি শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

তৃতীয় পাতা

মা, আজকে তোমার উদ্দেশ্যে শেষ লেখা লিখছি। আমার ডান হাত অবস হয়ে আসছে; আর হয়তো লিখতে পারব না। ওই দিন আমি একাই ধরা পড়েছিলাম। আমার ধরা পড়ার বদলে তিনজন সহযোদ্ধা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। ওরা আমাকে প্রথমেই পানিকাদার ভেতর বুকের বাম পার্শ্বে বেয়নেট চার্জ করে এবং মুখের ওপর অনবরত বুটের লাথি মারে। তখন আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। আমার মনের মধ্যে চোখের অন্তরালে তোমার মুখখানি বারবার

ভেসে উঠছিল। আমি হয়তো মরে যাচ্ছি! তোমার সাথে, আব্বার সাথে, রোকসানার সাথে আর দেখা হবে না! মা, তুমি বলেছিলে আমি কলেজে পড়া শেষ করলেই বড়ো মামার মেয়ে শাহেদার সাথে আমার বিয়ে দেবে। এ নিয়ে বড়ো মামানি আমাকে কতই না ইয়ার্কি ফাজলামি করত। শাহেদা প্রথম দিকে লজ্জিত হয়ে আমাকে এড়িয়ে চললেও পরবর্তীতে আমাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনত। সে বলত,–একলাস ভাইয়া, আপনি বিয়ে পাশ করবেন, আর আমি মেট্রিক পাশ করব। তারপর আমরা কিন্তু আর ভাই-বোন থাকব না। সে আরও বলত,–বিয়ের পরে আমি কিন্তু আপনাকে তুমি বলতে পারব না। এভাবে ভাবতে ভাবতে কখন যে আমি হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলাম জানি না। দুদিন পর আমি নিজেকে সীমান্তবর্তী গ্রাম ছাগলদিয়ার এক বাড়িতে দেখতে পাই। আমার হুঁশ ফিরে আসলে ওদের কাছেই জনতে পারি, গ্রামের নদীর ঘাটে কচুরিপানার মাঝে নাকি আমার লাশ দেখতে পায়। গ্রামের লোকেরা চকিদার ইউনুছ মিয়াকে খবর দেয়। তার নির্দেশে পাড়ার ছেলেরা আমাকে মরা লাশ ভেবে নৌকার বৈঠা দিয়া খুঁচা দিয়ে দেখে আমি হাত নাড়ছি। তারপর কয়েকজনে পাঁজাকোলা করে আমাকে ওই বাড়িতে নিয়ে আসে। একজন গ্রাম্য ডাক্তার আমার বুকের ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে ব্যথার ঔষধ দেয়। পরদিন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে আমি দু'জন ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে ৪/৫ মাইল পথ অতিক্রম করে ক্যাম্পে আসি। সহযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমি সকল ব্যথা ভুলে যাই। কিন্তু আমার এ ক্ষত তো সারবার নয়। কাল থেকে আবার ভীষণ জ্বর এসেছে, সারা শরীর ব্যথায় কাঁপছে। চোখে আবার ঝাপসা দেখছি। ডান হাতটা অবশ হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পের ডাক্তার বলেছেন, কিছুই করার নাই। বেয়নেট বিদ্ধ ফুসফুস হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং ডানপার্শ্বের ফুসফুসে পচন ধরেছে। দুদিন ধরে প্রসাব পায়খানা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাগো, আমি মনে হয় আর বাঁচব না। শুনলাম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে ঢুকে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে যুদ্ধ করছে। এবার নিশ্চয়ই দেশ স্বাধীন হবে–মুক্তিসেনারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বীরের ন্যায় দেশে ফিরবে। শুধু তোমার ছেলে ফিরবে না। আমার বড়ো দুর্ভাগ্য, আমি স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারলাম না। মাগো, তুমি কেঁদো না। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রক্ত আরও দেব'–এ দেশটাকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।' দেশ তো মুক্ত হবে একদিন, তোমার ছেলের রক্তের বিনিময়ে এবং প্রাণের বিনিময়ে। এ নিয়ে তো তোমার এবং আব্বার গর্ব হবার কথা। মা আমি আর পারছি না বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। ভীষণ মাথা ঘুরছে, হাত পা অবশ হয়ে আসছে চারদিকে অন্ধকার দেখছি। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে এর মাঝে আমি তোমার, আব্বার, রোকসানা ও শাহেদার ঝাপসা ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমাকে তোমরা মাফ করে দিও। বিদায়।

(এই শেষ লাইন লেখার পরেই একলাস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।)

শোভাষিনীর আর্তনাদ

ফরিদপুর-ঢাকা মহাসড়ক। ধুলদী গ্রামটিকে এই সড়ক দুই ভাগে ভাগ করেছে। ধুলদী বাজারটি রাস্তার পূর্ব পাশে। মঙ্গল ও শুক্রবারে এখানে হাট বসে। এই বাজারের পূর্ব দিকে ঐতিহ্যবাহী মোল্লাবাড়ি। ছোবান মোল্লার তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে আজমল পাশের গ্রাম কোমরপুর হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র, ১৯৭২ সনে মেট্রিক দেবে। আজমল পড়াশোনায় বেশ ভালো, ক্লাস ফাইভে এবং এইটে বৃত্তি পেয়ে মা বাবা এবং বংশের নাম উজ্জ্বল করেছে।

এই গ্রামে কয়েকজন হিন্দুর বসতি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে এই গ্রামে অনেক হিন্দু বসতি ছিল। কিন্তু নানা কারণে আস্তে আস্তে ধনী এবং প্রভাবশালী হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে চলে গেছে। পালবাড়ির সুশান্ত পাল এবং তার বড়ো ও মেজো ছেলে পরিতোষ পাল ও সমরেশ পাল বাবার সাথে থেকে গেলেও, ছোটো ছেলে বিজয়নাথ পাল বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে বছর দুই হলো কোলকাতায় চলে গেছে। সেখানে গড়িয়া হাটে সে কাপড়ের দোকান দিয়েছে। এর মাঝে দেশে এসে সে মা বাবাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করলেও বাবা সুশান্ত পাল কোনো ভাবেই ভারতে যেতে রাজী হননি। তিনি বলেন, আমি চৌদ্দপুরুষের রেখে যাওয়া ভিটামাটি ছেড়ে কখনও অন্য দেশে যাব না। তাছাড়া, বাড়ির পাশের মা বাবার সমাধীস্থল তাকে শ্রদ্ধাও মায়ার বন্ধনে আটকে রেখেছে।

পালদের বংশ পদবি অনুযায়ী মাটির জিনিসপত্র বানানোর রেওয়াজ থাকলেও এই পরিবার কিন্তু এ কাজ করে না। সুশান্ত পালের বাবা জগদীশ পাল ব্রিটিশ রেলওয়েতে টিকিট চেকারের চাকুরি করতেন। সুশান্ত পাল জমিদার ইশান বাবুর সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন। দেশ বিভাগের পর তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করতেন। এখন বয়স হয়েছে বলে অবসরপ্রাপ্ত। বড়ো ছেলে পরিতোষ পাল পরানপুর প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন। তার

এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে পলাশ কোমরপুর স্কুলে ক্লাস টেনে এবং মেয়ে শোভাষিনী স্থানীয় ধুলদী স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। মোল্লাবাড়ির সাথে পালবাড়ির সম্পর্ক যুগ যুগান্তরের। দুই বাড়ির লোকজন দুই ধর্মে বিশ্বাসী হলেও অন্তরের ভালোবাসার সম্পর্ক একসূত্রে বাঁধা এবং অটুট। ইদের সময় পালবাড়ির লোকেরা মোল্লাবাড়িতে মোরগ পোলাও এর স্বাদ গ্রহণ করে। আবার পূজা-পার্বণে মোল্লাবাড়ির লোকেরা পালবাড়িতে আপনজনের মতো আপ্যায়িত হয়। বিশেষ করে দূর্গাপূজার সময় বউঝিসহ পরিবারের ছোটোবড়ো সকলে পালবাড়িতে নেমন্ত্রণ খায়।

আজমল এবং পলাশ একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ার সুবাদে দুজনের মাঝে হরিহর আত্ম সম্পর্ক। একজন ছাড়া আরেকজন চলতে পারে না। সময় পেলেই দুজনে এক সাথে সময় কাটায়। পলাশের মা আজমলকে নিজের সন্তানের মতো আদর করে, নিজ হাতের তৈরি লুচি-আলুর দম এবং নারিকেলের নাড়ু খাওয়ান। আজমলের মাও পলাশকে একইরকম স্নেহ করেন। মাঝে মাঝেই লাজুক ছেলেটিকে তেলেভাজা পাকান পিঠা এবং খেজুরে গুড়ের ক্ষীর খাওয়ান। দুজন একসাথে পলাশদের বাড়িতে পলাশের বাবা পরিতোষ মাস্টারের কাছে অঙ্ক শিখে। মেয়ে শোভাষিনীও মাঝে মাঝে ওদের সাথে বসে বাবার কাছে অঙ্ক শিখে। আজমল ক্লাশে ফাস্টবয় এবং অঙ্কে বেশ পাকা। কাজেই অনেক সময় সে শোভাষিনীকে অঙ্ক শিখিয়ে দেয়। শোভাষিনী ছুটে রান্না ঘরে যেয়ে দুই দাদার জন্য মায়ের রান্না করা জলখাবার নিয়ে আসে। আজমল খেতে না চাইলে শোভাষিনী অনেক সময় জোর করে তাকে খাওয়ায়, এমন কি কখনো কখনো মুখে খাবার তুলে দেয়। আজমল কেন যেন শোভাষিনীকে বাধা দিতে পারে না। ওর মুখের দিকে তাকালে সে এক মায়ার সাগরে ডুবে যায়। মনে হয় সে যেন কত আপন জন, হৃদয়ের কত কাছাকাছি! মাঝে মাঝে শোভাষিনীকে অঙ্ক শেখাতে যেয়ে আজমল খেই হারিয়ে ফেলে। মনে হয় এক অজানা জগতে দুজনে এক নীলিমার আকাশে উড়ছে। মনে হয় এই ধুলদী গ্রামের চেনা পথ ঘাট ছেড়ে কোনো এক অচেনা মেঠো পথে দুজনের হাত ধরে দুজনে হাটছে!

– আজমলদা কি ভাবছেন? শোভাষিনী প্রশ্ন করে। হঠাৎ করেই আজমলের মাঝে সম্বিৎ ফিরে আসে।

– না তো, কই? কিছু তো ভাবছি না। আজমল জবাব দেয়।

– অবশ্যই ভাবছিলেন; কোথায় যেন আপনার মন হারিয়ে গিয়েছিল, এই বলে শোভাষিনী মুচকি হাসে। আজমল ওর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়। হাসলে শোভাষিনীর দু-গালে টোল পড়ে, এতদিন আজমল তেমনভাবে লক্ষ্য করেনি। এতক্ষণ আনমনা হয়ে কি ভাবছিল আজমল- তা লজ্জায় বলতে পারে না। তবে একটু সাহস করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে।

– তোমাকে নিয়ে ভাবছিলাম।

– দুর তাই কি হয়? আপনি মিথ্যা বলছেন।

সাঁঝের আকাশের মতো শোভাষিনীর চোখেমুখে লজ্জার লাল আভা ফুটে উঠে। ইতিমধ্যে পলাশ ফিরে আসলে ওইদিনের মতো লেখাপড়া শেষ হয়।

সপ্তাহখানেক হলো– ফরিদপুর শহরে মিলিটারি ঢুকেছে। গোয়ালন্দ হয়ে ফরিদপুর আসতে রাস্তার দুধারের অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে; এবং কয়েকদিনে শহর এবং আশেপাশের অনেক নিরীহ মানুষ বিশেষ করে হিন্দুদেরকে হত্যা করেছে এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এমনকি অনেক জায়গায় নারীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। ফরিদপুর শহরে প্রবেশের মুখে জগবন্ধু আঙ্গিনায় কীর্তনরত সাতজন সাধুকে পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করে। পরদিন কানাইপুর শিকদার বাড়িতে ঢুকে এগারোজন হিন্দু নারী-পুরুষকে একইভাবে হত্যা করে এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা এরপর অবাঙালি বিহারি এবং রাজাকার আলবদরদের সহায়তায় শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে অপারেশন শুরু করে। বিশেষ করে হিন্দুরা আক্রান্ত হয় এবং তাদের ধনসম্পদ বাড়িঘর লুটতরাজ করা হয়। এই অবস্থায় পালবাড়ির লোকজন নিরাপত্তাহীনতার কথা চিন্তা করে একরাতে বাড়িঘর ফেলে আরও ভেতরে গ্রামের দিকে চলে যায়। পরিতোষ পাল বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় বাড়ির গাভি দুটিকে মোল্লাবাড়িতে রেখে বন্ধু সোবান মোল্লার কাছে তিন ঘরের চাবি দিয়ে যায়।

দিনদিন দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। অগণিত হিন্দুরা ভিটামাটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে চলে যায়। আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী এবং যুবক শ্রেণির অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যে চলে যায়। এদিকে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। জামায়াতে ইসলাম, নিজামে ইসলামসহ পাকিস্তানপন্থি লোকজন শান্তিকমিটি এবং রাজাকার আলবদর বাহিনীতে যোগ দেয়। অবাঙালি বিহারিদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া

হয়। এদের সকলের সহযোগিতায় পাকিস্তানিবাহিনী গ্রামগঞ্জে হানা দিতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খোঁজার অজুহাতে তারা হাট-বাজার এবং বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং নির্বিচারে মানুষজনকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। প্রতিদিনই নারীদের ওপর বলৎকারের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানপন্থি জামাত ও শান্তিকমিটির লোকজন অর্থ ও ক্ষমতার লোভে সুন্দরী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ক্যাম্পে তুলে দেয়। চারদিকে হিন্দু এবং আওয়ামীলীগপন্থি মানুষের বাড়িতে লুটতরাজ হতে থাকে। মোল্লাবাড়ির লোকজন এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাবশালী। এই বাড়ির একজন ফরিদপুর পৌরসভার সেক্রেটারি। দুর্ধর্ষ কালু বিহারি পৌরসভার কর্মচারী হওয়াতে, মোল্লাবাড়িতে কেউ নজর দিতে সাহস পায়নি। কাজেই চারদিকে হিন্দুবাড়িতে লুট হলেও মোল্লাদের আগলিয়ে রাখা পালবাড়িতে ঢুকতে কেউ সাহস পায়নি।

বন্ধু পরিতোষ পালের চলে যাওয়ার পর হতেই সোবান মোল্লার মন খারাপ। সে বউ সন্তানদের নিয়ে কোথায় আছে কেমন আছে জানে না। প্রিয় বন্ধু এবং তার পরিবারের দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবতে ব্যথায় মন খারাপ হয়ে যায়। একদিন সকালে ছেলে আজমলকে ডেকে অভিযোগের সুরে বলেন– তুমি তোমার এত দিনের বন্ধু পলাশকে ভুলে গেছ? ওরা এখন কোথায় আছে কেমন আছে, -তার কি খোঁজ নিয়েছ? আজমল কিছু না বলে বাবার সামনে মাথা নিচু করে থাকে। সত্যিই তো, সে এতদিন ওদের খোঁজখবর নেয়নি। পলাশ কেমন আছে? ওদের পরিবার কেমন আছে? ভাবতে বুকের মাঝে ব্যথার ঢেউ উঠে। সেই ব্যথা উপচিয়ে মনের মধ্যে শোভাষিনীর বিবর্ণ অস্পষ্ট মুখের ছবি ভেসে উঠে। নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হয় আজমলের। পরদিন সকালে সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে ৩/৪ সের চাল এবং সের দেড়েক মসুরি দুটি আলাদা ব্যাগে করে আজমল অচেনা পথে রওয়ানা হয়। ওরা আগেই জানত পলাশরা ইশান গোপালপুরে ওদের এক দূরসম্পর্কীয় পিসির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে পালবাড়ি খুঁজে পায় আজমল। এখানে বেশ কয়েক ঘর হিন্দুদের বাস। পালবাড়ি ছাড়া মনমোহন বাবুর বংশধররা এখানে বাস করে। তাদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল। তিনতলা ইটের দালানের ধ্বংসাবশেষ এখনো ওই বাড়ির লোকদের কৌলিনত্ব প্রকাশ করছে। আজমল সাইকেলটি ওঠানে বড়োই গাছটির সাথে ঠেক দিয়ে রেখে একটু সামনে এগিয়ে কাছারি ঘর পার হয়ে বাইরের

বারান্দার কাছে যায়। তারপর জামাটি একটু নিচে টেনে ধুলাবালি ঝেড়ে নেয় এবং মাথার চুল ঠিক করে।

– পলাশ! পলাশ কি বাড়িতে আছে? আজমল উচ্চস্বরে ডাক দেয়। ভেতর থেকে ভয়ার্ত নারী কণ্ঠে জবাব দেয়- কে?

– কে ডাকছ পলাশের নাম লইয়া?

– আমি আজমল, পলাশের বন্ধু, একদমে কথা বলে আজমল জবাব দেয়।

– ও আজমল! তা কেমন আছ বাবা? তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?

আজমল জবাব দেয়ার আগেই কপাট খুলে বারান্দায় আসে পলাশের মা। প্রথম নজরে আজমলের কাছে কিছুটা অচেনা লাগে। শুকনো মুখ, ঘোমটা উপচিয়ে সাদা অবিচ্ছন্ন চুল। পরনে ময়লা বিবর্ণ টিয়া রং এর তাঁতের শাড়ি।

– মাসিমা, পলাশ কই? ওরা বাড়িতে নাই? ওরা বলতে শোভাষিনীকে বোঝাচ্ছে। তবে একটু অব্যক্ত লজ্জায় ওর নাম মুখে আনতে পারে নাই।

– পলাশ বাড়িতে নাই। তবে শোভাষিনী আছে; বাড়িতে গোবরের ঘটুটা বানাচ্ছে। পলাশ লক্ষ্মীদাসের হাটে গেছে, এখনই এসে পড়বে। আজমল তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধা চাল ও মসুরের ব্যাগ দুটি পলাশের মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে, –এগুলো আমার আব্বা পাঠিয়েছে।

পলাশের মায়ের ব্যাগ ভর্তি চাল পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। দুহাত কপালে ছোঁয়ায়ে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেন, –ভগবান তোমার মা-বাবা এবং তোমাদের মঙ্গল করুন। আজমলকে বসবার ঘরে একটি টুল পেতে দিয়ে পলাশের মা বাড়ির ভেতর চলে যায়। কিছুক্ষণ পর একটি ছোটো পিতলের বাটিতে তিনটি মুড়ির মোয়া ও এক গ্লাস পানি নিয়ে একটি ১২/১৪ বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকে বলে,

– দাদা কেমন আছেন? ঘরে জলখাবার দেয়ার মতো অন্য কিছু নাই। আজমল কথা কেড়ে নিয়ে বলে, একি! তুমি? শোভাষিনী? তুমি এই বেশে কেন? তোমার এ কী অবস্থা? শোভাষিনী কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। আসলেও এ কয়েকদিনে শোভাষিনীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফ্রক পাজামা রেখে শাড়ি পরছে। দুহাত ঢেকে লম্বা হাতা ব্লাউজ, নাকে নথ, কানে দুল এবং গলায় ধানতাবিজ। চোখেমুখে বয়স্ক মহিলার ছাপ। ইতিমধ্যে ওর মা, এসে বলল,–একি কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা। এই তো

সামান্য দুটি মোয়া। ঘরেতে কিছুই নাই তোমাকে দেবার মতো। কতদূর থেকে এসেছ বাবা–এতটুকু মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম কর, পলাশ এখনই এসে যাবে। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি হয়তো শোভাষিনীকে দেখে অবাক হচ্ছ। আসলে ওকে আমরা ইচ্ছে করেই বয়স্ক মহিলা সাজিয়ে রাখছি, যাতে ওর ওপর এলাকার কোনো কুচক্রীদের নজর না পড়ে।

এবার আজমল আসল রহস্য বুঝতে পারে। মা ভেতর বাড়ি গেলে শোভাষিনী একটু আদুরে কণ্ঠে বলে, –আজমল দাদা, আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন যে চিনতে পারলেন না? এই বলেই সে ডান হাতটি এগিয়ে দিয়ে বলে–দেখুন তো চিনতে পারেন কি না? ছোটো বেলায় আমাদের বাড়িতে বড়ো পূজার সময় বাজিতে আগুন ধরাতে যেয়ে আমার কেনি আঙুল পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখনো সেই দাগ পূরণ হয়নি। আজমল শোভাষিনীর হাতটি টেনে নিয়ে বলে, –তাই তো। এতদিন তো লক্ষ করিনি, সেই পোড়া দাগটি এখনো আছে! –কীভাবে লক্ষ করবেন? আপনি কি কখনো আমার হাতটি ধরে দেখেছেন? আজমল চমকে উঠে! এখনও শোভাষিনীর হাতটি তার হাতের ওপর। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে কিছু বলতে যেয়েও মুখে কোনো শব্দ বেরোয় না। একদৃষ্টিতে শোভাষিনীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এ কয়েকদিনে ন্যাকামি, বোকামি ও দুষ্টমিতে ভরা মেয়েটি অনেক বড়ো হয়ে গেছে। শাড়ি ব্লাউজ আর গয়নাঘাটিতে ঢাকা বর্তমান বেশভুষা ছাপিয়ে শোভাষিনীর আসল চেহারাটা ফুটে উঠে আজমলের অন্তর্চক্ষে। এক অব্যক্ত ব্যথায় মনের ভেতর এক অজানা অনুভূতি মোচর দিয়ে উঠে। শোভাষিনীর জন্য এত খারাপ লাগছে কেন? কোনো মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছে দুজন? নাকি একে বলে ভালোবাসা!

– কী ভাবছেন দাদা? শোভাষিনীর কথায় আজমলের সম্বিৎ ফিরে আসে।

– না কিছু না; ভাবছিলাম তোমাকে নিয়ে। আজমল কিছুটা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়।

– আমাকে নিয়ে? আমি আবার কবে থেকে আপনার ভাববার বিষয় হলাম? শোভাষিনী আরও একটু গা ঘেঁষে এসে উত্তর দেয়।

– অনেকদিন থেকেই তোমাকে নিয়ে কেন যেন আমি ভাবছি। কেন যেন সারাক্ষণ আমার বুকের মধ্যে তোমার একটি ছায়া বিচরণ করে। আমার মনে হয়, শোভাষিনী, আমি তোমাকে মনের অজান্তে কখন যেন ভালোবেসে ফেলেছি। আজমল একদমে কথাগুলো বলে ফেলে।

– আচ্ছা তুমিও কি আমাকে নিয়ে ভাবো? আজমল আবার শোভাষিনীর ডান হাতটি ছুঁয়ে প্রশ্ন করে। শোভাষিনী হাতটি ছাড়িয়ে না নিয়ে বলে, –হয়তোবা হবে। ভগবানের হয়তো এটাই ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের দুই পরিবার কি এটা মেনে নেবে?

– কিরে বন্ধু কখন এসেছিস? পলাশ দূর থেকে দেখেই আজমলকে প্রশ্ন করে। দুই বন্ধুর অনেকক্ষণ গল্প হয়। পলাশদের এখন খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছে না। ওর বাবা পরিতোষ বাবুর হাতে যে জমানো টাকা ছিল, তা প্রায় শেষ। পিসির স্বামী শ্রীনাথ পালের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। আদি বনেদি ব্যাবসা–মাটির হাঁড়িপাতিল ও থালা-বাসন বানিয়ে হাটে হাটে বিক্রি করে সংসার চলে। বড়ো ছেলেটি আগেই তার মামার সাথে কোলকাতা চলে গেছে। বড়ো বাজারে মুদি দোকানের কর্মচারী। ছোটো ছেলে এবং বউ মাটির জিনিসপত্র তৈরি করতে সাহায্য করে। এখন বাধ্য হয়ে পরিতোষ বাবু ধুতি-পাঞ্জাবি রেখে লুঙ্গি-গেঞ্জি পড়ে ভায়রা ভাই শ্রিনাথ পালের সাথে চাকা ঘুরিয়ে মাটির হাঁড়িপাতিল তৈরি করেন। আজমল স্থানীয় লক্ষ্মীদাসের হাটে পিসেত ভাইয়ের সাথে মাটির জিনসপত্র বিক্রি করে। পলাশের মাকেও তার বোনের সাথে কাজ করতে হয়। শোভাষিনী ওই সকল কাজ না করলেও তাকে সংসারের খুটিনাটি সকল কাজ করতে হয়। তাছাড়া, অনেক সময় মায়ের সাথে পালান থেকে মাটি এনে হাঁড়িপাতিল তৈরি উপযোগী খামরি তৈরি করতে হয়–তখন কাদা মাটিতে গা গতর ছয়লাব হয়ে যায়।

জুলাই আগস্টের দিকে পরিস্থিতি একটু ভালোর দিকে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক-আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে এটা প্রমাণ করার জন্য পাকিস্তানিজান্তা জনগণের ওপর তাদের অত্যাচারের মাত্র কিছুটা শিথিল করেছে। ফরিদপুরে ডিস্ট্রিক মিলিটারি অ্যাডমিনিসট্রেটর মেজর ইজাজ স্থানীয় শান্তিকমিটির সভাপতিকে ডেকে নিয়ে বলেছেন, ফরিদপুরে রেডক্রসের লোকজন আসছে। যেভাবেই হোক এখানকার অবস্থা শান্তিপূর্ণ প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য হিন্দুদেরকে যতদূর সম্ভব সাহস ভরসা দিয়ে বাড়িতে আনতে হবে। এবং বিদেশি সংস্থার লোকদের কাছে যাতে আমাদের শেখানো কথা বলে তার জন্য চাপ দিতে হবে।

কৃষ্ণনগরের চেয়ারম্যান মুসলিম লীগ নেতা জলিল মৌলবির আশ্বাসে পরিতোষ পাল একদিন স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে ধুলদীর বাড়িতে ফিরে আসে। সোবান মোল্লা বন্ধু পরিতোষ পালকে বুকে জড়িয়ে নেয়। বন্ধুর রেখে যাওয়া ঘরের চাবি এবং দুটি গাভি বুঝিয়ে দেয়। প্রায় সপ্তাহখানেক মোল্লাবাড়ি থেকে

পালবাড়িতে রান্না করা খাবার পাঠানো হয়। তাছাড়া, সোবান মোল্লা ছেলে আজমলের মাধ্যমে ওই পরিবারের জন্য চাল ডাল, তরিতরকারি পাঠায়। পরিতোষ পাল পুনরায় তার স্কুলের মাস্টারি চাকরিতে জয়েন করে। পরানপুর স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব পরিতোষ মাস্টারের হাতে সামান্য কিছু টাকাপয়সা তুলে দেন। ছেলে পলাশ স্কুলে যাওয়া শুরু করলেও মেয়ে শোভাষিনী বাসায় থেকেই লেখাপড়া চালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে আজমল কয়েকদিন পরিতোষ মাস্টারের কাছে অঙ্ক শিখতে এসেছে। শোভাষিনীর সাথে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। প্রতিবারই শোভাষিনীর চোখেমুখে একটু লজ্জার ভাব ফুটে উঠেছে।

– কেমন আছ, শোভা? এই প্রথম আজমলের মুখে শোভা ডাকে শোভাষিনী কিছুটা বিব্রত ও লজ্জিত হয়।

– ভালো আছি। আপনি তো মোটেও আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন না। সেদিনের কথা কি সব ভুলে গেছেন?

– কোনো দিনের কথা?

– ওই যে পিসির বাড়িতে আমার হাত ধরে যা বলেছিলেন।

আজমল এবার নিজেই লজ্জা পায়। কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। তবে এটা বুঝতে পারে শোভাষিনী এখন অনেক পূর্ণ বিকশিত, অনেক ম্যাচিউরড। তার ইচ্ছে হয় শোভাষিনীর হাতটি ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকতে।

আজ মঙ্গলবার, ধুলদী বাজারে হাটবার। পরিস্থিতি আগের মতো না হলেও মানুষজন বেচাকেনার জন্য হাটে জমায়েত হয়েছে। কাদের মিয়ার ধান ভাঙার কল চালু হয়েছে, ফরিদপুর শহর থেকে ব্যাপারীরা শাড়ি কাপড়ের পোঁটলা এনে দোকানে বসেছে। খলিলপুরের জেলেরা নানাধরনের মাছের ডালা নিয়ে বসেছে। দুধের বাজার, গুড়ের বাজার বসেছে; সত্যবাবুর চুলকাটার ফুটপাত সেলুনও বসেছে।

বিকেলের দিকে হঠাৎ করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। বাজারের প্রবেশপথে সাদা-কালো ধোয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। কারা যেন চিৎকার দিয়ে বলে, বাজারে মিলিটারি ঢুকেছে। কোনো কিছু ভালোভাবে না শুনেই মানুষজন যার যার মতো দিগবিদিক ছুটে পালাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পালবাড়ির দিক থেকে নারী কণ্ঠে আত্মচিৎকার শোনা যায়। পরিতোষ পাল হাট থেকে দৌড়ে বাড়ির দিকে যায়।

পরিতোষের স্ত্রী গায়ত্রীদেবী বারান্দার খুঁটিতে বারবার মাথা ঠুকে চিৎকার করছে, কেন যে বাড়িতে ফিরলাম! আমার শুভাকে কেন হারালাম? ওরা কেন আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলল? ওদের ঘরে কি মা, বোন, মেয়ে নাই? হায় হায়! আমি এখন কী নিয়ে থাকব? ভগবান! কেন তুমি আমাকে বাঁচায়ে রাখলা?

ইতিমধ্যে আশেপাশের সবাই পালবাড়িতে জমায়েত হয়েছে। সোবান মোল্লা ছেলে আজমলকে নিয়ে ওই বাড়িতে এসেছে। শোনা গেল, রাজাকার রহমান মোল্লার সহযোগিতায় ৭/৮ জন পাকিস্তানি আর্মি সেনা বাজারে ঢুকে গোলাগুলি করার পরে প্রথমে কালাম মুন্সীর বাড়িতে ঢুকে তার কলেজে পড়ুয়া ছেলে মাহমুদকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করেছে। সেই সাথে বাড়ির অন্তঃসত্ত্বা বউকে ধর্ষণ করেছে। অতঃপর ওরা পালবাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি করে পরিতোষ পালের ছেলে পলাশকে হত্যা করেছে। ছোট বোন শোভাষিনী ভাইকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসলে জল্লাদ বাহিনীর তিনজন সৈন্য শোভাষিনীকে টেনে হিঁচড়ে রান্না ঘরে নিয়ে গণধর্ষণ করছে। এক পর্যায়ে শোভাষিনী সুযোগ পেয়ে তরকারি কাঁটার বটি দিয়ে একজনের মাথায় কোপ দিলে আরেক পাষান্ড শোভাষিনীর তলপেটে বেয়নেট চার্জ করে। রক্ত মেঝে ভাসিয়ে উঠান গড়িয়ে নিচে পড়েছে।

শোভাষিনীর আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে গেছে।–মাগো আর পারছি না, আমি মরে যাচ্ছি! আমাকে তোমরা একটু পানি দাও। আজমল কোনো কিছু না ভেবেই উন্মাদের মতো সামনের মানুষজনকে ঠেলে রান্নাঘরে যায়। সামনে শোভাষিনীর বীভৎস মৃতবৎ চেহারা দেখে সে থমকে যায়। রক্ত সাগরে ভাসা শোভাষিনীর মুখখানা তখনো লাল গোলাপের মতো প্রস্ফুটিত! আজমলকে সামনে দেখে শোভাষিনীর বিবর্ণ মুখে একচিলতে হালকা হাসির রেখা দেখা যায়।

– আজমল দাদা! আমার ডান হাতটা একটু ধরুন না। আজমল এক আশ্চর্য সম্মোহনে তাড়িত হয়ে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে শোভাষিনীর রক্তভেজা হাতটি নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নেয়।

– ধন্যবাদ, দাদা। আর বাঁচতে পারছি না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিদায়! শোভাষিনীর মাথাটি আজমলের কাঁধের ওপর কাত হয়ে পড়ে যায়।

অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়

ঘন বৃষ্টিতে অবিরাম বর্ষায় কুমার নদীতে পানি বেড়েছে। নদীর পার উপচিয়ে, ফরিদপুর-ঢাকা সি এবি রাস্তার দুই পার্শ্বের খাল দিয়ে বন্যার পানি কোমরপুর, রঘুনন্দনপুর এবং শোভারামপুর গ্রামের অনেকটাই ডুবিয়ে দিয়েছে। গরিব মানুষজন বিশেষ করে পুরুষ ও ছোটো ছেলেরা সরকারি রাস্তার পাশে পাটখড়ি দিয়ে টং ঘর বানিয়ে রাতযাপন করছে। তাছাড়া, রাস্তার পাশে উঁচু জায়গায় অনেক গৃহস্থ বাড়ির গরু-ছাগলের ঠাঁই মিলেছে। বাহিরদীয়া গাড়িয়াল বাড়ির ঘোড়াগুলোও এখন মুক্তভাবে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। মাঝে মাঝে কমবয়সি ছেলেরা লুঙ্গিতে কাছা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দৌড় প্রতিযোগিতা করছে। রঘুনন্দনপুর গ্রামটি নদী হতে বেশ দূরে। কাজেই এখানে তেমন কারো নৌকা নাই। এই বন্যার সময় রাস্তা হতে বাড়িতে যাওয়ার একমাত্র সম্বল কলা গাছের ভেওয়া (ভেলা)। এখানেও কৌলিন্যত্বের স্বাক্ষর আছে। অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ভেলাগুলো শক্ত মোটা ও লম্বা কলাগাছের তৈরি এবং এতে কাঠের টুল বসিয়ে কর্তা ব্যক্তিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। গরিবদের ভেলা গরিবদের মতোই, জড়াজীর্ণ দুর্বল কলাগাছের তৈরি।

আসলামদের বাড়ি অবশ্য বড়ো রাস্তার পাশেই। বাড়ির সাথে সংযুক্ত কাঁচা রাস্তাটি বাঁশের সাঁকো দিয়ে বড়ো রাস্তার সাথে সংযুক্ত; তাই কাপড়চোপড় না ভিজিয়েই রাস্তায় এসে ফরিদপুর শহর এবং হাট-বাজারে যাওয়া যায়। আসলাম কোমরপুর হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। সে বেশ মেধাবী, ক্লাসে ফাস্ট বয়; ৫ম এবং অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। ২৬ মার্চ ঢাকায় ক্রাক ডাউনের পরে এপ্রিলের মাঝামাঝি পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে ফরিদপুরে আসে। ফরিদপুর ঢোকার সময় সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা গোয়ালন্দে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়। এরপর হতে পাকিস্তানি আর্মিরা স্থানীয় রাজাকার আলবদর এবং বিহারিদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। জুলাই-

আগস্ট মাসে বিশ্ববাসীকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক দেখাতে, দমন পীড়নের মাত্রা একটু কমে আসলেও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অত্যাচার, জুলুম এবং হত্যার পরিমাণ আবার বেড়ে যায়।

আসলামদের বাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ গজ দূরেই সালাম কেরানির বাড়ি। তিনি জেলা ফুড অফিসের বড়ো বাবু হিসেবে চাকরি করে অবসর গ্রহণ করে শ্বশুরবাড়ির কাছে ২০ শতাংশ জমি কিনে বাড়ি করেছেন। সালাম সাহেবের আসল পৈতৃক বাড়ি ছিল মাদারীপুর কালকিনি থানার সাহেবরামপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন চাকরি সূত্রে ফরিদপুর অবস্থান; তদুপরি ছেলেমেয়েদের দেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তিনি শহরের বাইরে নিজের ক্রয়কৃত জমিতে ইটের দেওয়াল দিয়ে দুটি টিনের ঘর তৈরি করেছেন। ছিমছাম ছোটো পরিবার। সুদীর্ঘ ৩০ বছর চাকরি জীবনের বেতন এবং অন্যান্য উপার্জন থেকে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে পোস্ট অফিসে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রেখেছেন। তাছাড়া, পেনশনের আয় হিসেবে হাজার ত্রিশ টাকা পেয়েছেন। সালাম সাহেবের তিন সন্তান: এক ছেলে, দুই মেয়ে। সবচেয়ে বড়ো মেয়ে নাজমা ইশান গার্লস স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করার পরে বিয়ে দিয়েছেন নিজেদের মধ্যেই। কালকিনির আকন বাড়ির ছেলে। সে বিএ পাশ করে আন্ডারচর স্কুলে মাস্টারি করে। তারপরের ছেলে আজমল মহিম হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র। সবচেয়ে ছোটো মেয়ে সামছুন নাহার কোমরপুর স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। সালাম সাহেব শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে আসালমদের আত্মীয় হন। আসলামের বড়ো বোনের বিয়ে হয়েছে সালাম সাহেবের ছোটো শ্যালকের সাথে। সেই হিসেবে সালাম সাহেবের মেয়েদের সাথে আসালামের বিয়াই-বিয়ান সম্পর্ক। সালাম সাহেবের ছোটো মেয়ে সামছুন নাহার এবং আসলাম একই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। আত্মীয় হলেও শহুরে মেয়ে বলে নাহার আসলামকে প্রথমে বেশ এড়িয়ে চলত। কিন্তু নাহারের বাবা-মা পরশী হিসেবে আসলামদের পরিবারের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিশেষ করে বিপদ-আপদে যাতে তাদের সাহায্য পাওয়া যায় তার জন্য আসলামের বাপ-চাচাদের সাথে সুন্দর সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ইদে এবং বিশেষ উৎসবে দুই পরিবারের মধ্যে নিয়মিত যাওয়া আসা ছিল। বড়ো মেয়ে নাজমার বিয়েতে আসলাম এবং তার ভাইয়েরা বেশ খাটাখাটুনি করেছে। বিয়ের গেট তৈরি করা থেকে বরযাত্রীর আপ্যায়ন, এবং লোকজনের খাওয়ানো- ইত্যাদি ব্যাপারে আসলাম বন্ধু আজমলের সাথে জান-পরান দিয়ে কাজ করেছে। নাহারের মা আমেনা

বেগম আসলামকে নিজের ছেলের মতো আদর স্নেহ করেন। আসলাম স্কুলে ফাস্ট বয় এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে এই আদর এবং মূল্যায়নটা আরও একটু বেশি। ছেলে আজমল এবং মেয়ে নাহার–দুজনেই অঙ্কে বেশ কাঁচা। অথচ আসলাম পাটিগণিতে তুখোড় মেধাবী। সে ক্লাস সেভেনে থাকতেই যাদব বাবুর পাটিগণিতের বই শেষ করে ছেলেছে। এ পর্যন্ত কোনো ক্লাসেই সে অঙ্কে ১০০ এর কম নম্বর পায় নাই। আমেনা বেগম আসলামকে বলেছেন, তুমি মাঝে মাঝে আজমল এবং নাহারকে অঙ্ক শেখাবে। এ ব্যাপারে আমেনা বেগম তার বেয়াইন আসলামের মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছেন। আসালামও রাজি হয়।

প্রথম দিন পড়াতে যেয়েই আসলাম বেশ অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বন্ধু আজমল বলে, আমি কিন্তু তোমাকে টিচার হিসেবে মানতে পারব না; আর ফাঁকিজুকি দিলেও মাকে আমার ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে পারবা না। কিন্তু নাহার তার উলটো। প্রথম দিনেই আসলামের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আজ থেকে আপনি আমার স্যার এবং আমি আপনার ছাত্রী। ভাইয়া ঠিকমতো না পড়লেও আমি কিন্তু ঠিকমতো ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতে চাই। আমি ভালোভাবে আপনার কাছে পড়ব এবং তারপর আগামীবার বৃত্তি পরীক্ষা দেবো। মা বলেছেন, ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ না করলে ভালো বিয়ে হবে না এবং আপুর মতো স্কুল মাস্টারের সাথে বিয়ে দিতে হবে। একদমে কথাগুলো বলে নাহার লজ্জায় মাথা নিচু করে। আসলামও কেমন যেন অব্যক্ত লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না। এতোটুকুন মেয়ে এমন সাহসী হয়ে কথাগুলো বলল কীভাবে? আসলাম কিছুটা অবাক হয়ে যায়।

সামছুন নাহার কিন্তু একেবারে ছোট্ট মেয়ে নয়। বাবা সালাম সাহেব প্রায় ছয়ফুট লম্বা, মা আমেনা বেগমও বেশ দীর্ঘাঙ্গী এবং সুন্দরী। তাদের মেয়ে হিসেবে সে বয়সের চেয়ে বেশি হৃষ্টপুষ্ট এবং তার একহারা বাড়ন্ত শরীর। বড়োবোন নাজমার মতো গায়ের রং উজ্জ্বল ফরসা, টিকালো নাক, মায়ের মতো লম্বা চুল এবং হাসলে উভয় গালে টোল পড়ে।

আজমলই নীরবতা ভাঙে। – ঠিক আছে, মায়ের ইচ্ছায় তুমি আমাদের দুজনেরই গৃহ শিক্ষক। তবে নাহার নিয়মিত এবং আমি অনিয়মিত, আমি শুধু অঙ্ক শিখব।

সেদিন আর অঙ্ক শেখানো হয় না। আসলাম সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি গ্রামার বই থেকে Voice Change নিয়ে আলোচনা করে। Passive Voice

Change এর উদাহরণ: চিঠিটি তার দ্বারা লেখা হয়েছিল। The letter was written by him. আজমল সঠিক উত্তর দিতে না পারলেও নাহার ঠিক ঠিক উত্তর দেয়। নাহারের চোখমুখে বেশ জয়ের উৎফুল্লতার ভাব ফুটে উঠে। আসলাম দুজনকেই ভালোভাবে উদারহণ দিয়ে Active Voice এবং Passive Voice এর নিয়মকানুন শিখিয়ে দেয়। সে দিনের মতো ক্লাস শেষ করলো। আমেনা বেগম এসে খোঁজখবর নেন এবং যাবার বেলায় আসলামের মায়ের জন্য হাতে বানানো পাটিসাপটা পিঠা দেন।

এর দুদিন পরে স্কুল হতে ফিরলে আসলামের মা বলেন, নাহারের মা তোকে পড়াতে যেতে বলেছেন। বিকেলে ওদের বাসায় যেয়ে দেখে আজমল নাই, বাবার সাথে মাদারীপুর গেছে বড়ো বোনকে আনতে। কাজেই আজ শুধু নাহারকে পড়াতে হবে। ওদের পড়ার ঘরে নাহারকে একাকী পড়াতে আসলামের মধ্যে একটা আড়ষ্টতা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিলেও নাহার একেবারেই স্বাভাবিক। সে বলে, ভালোই হলো, ভাইয়া নাই আমাকে ভালোভাবে অনেকক্ষণ পড়াতে পারবেন। আসলাম উত্তর দেয়, আপনাকে কিন্তু আরও সিরিয়াস হতে হবে। এবার একটু মুচকি হেসে নাহার বলে, ছাত্রীকে কী কোনো শিক্ষক আপনে বলে? বয়সে ছোটো হলেও নাহারকে আসলাম এতোদিন আপনি বলেই সম্বোধন করত। তাছাড়া, কিছুটা আত্মীয়ের সম্পর্ক হলেও এতোদিন লাজুক এবং চরম ভদ্র প্রকৃতির ছেলে আসলাম নাহারকে অতটা সহজ করে নিতে পারে নাই। তবে, আজকে বুকে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে নাহারের কথার উত্তর দেয়, ঠিক আছে, আজ থেকে আপনাকে তুমি বলব। নাহারের ঠোঁটে একটা বিজিতের হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। এদিন আসলাম নাহারকে আগের দিনের অসমাপ্ত ইংরেজি Voice Change এর পাঠ শেষ করে অঙ্কের বই নিয়ে বসে। ভাজ্য, ভাজক ও ভাগফলের জটিলতা নাহারের মাথায় ঢুকাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। আসলাম বই থেকে কয়েকটি অঙ্কের সমাধান করতে দিয়ে বলে, এগুলো পরবর্তী ক্লাসে করে আনবা। না পারলে কিন্তু বেতের বাড়ি খেতে হবে। নাহার হেসে বলে, পারবেন তো আমাকে মারতে? আসলাম কৃত্তিম দৃঢ়তার সাথে বলে, অবশ্যই পারব। সেই সময় নাহারের মা আমেনা বেগম প্লেট করে কিছু নাশতা নিয়ে রুমে ঢুকে বলেন, আমি সব শুনেছি। তুমি অবশ্যই ওকে শাসন করবে, ও পড়াশুনায় খুব অমনোযোগী। আমি চাই তোমার কাছে পড়ে নাহার এইটে বৃত্তি পরীক্ষায়

ভালো করুক। আসলাম মৃদু স্বরে বলে, সে তো ভালোই পারছে। আমিও চেষ্টা করব ওকে সবকিছু শেখাতে।

দুদিন পরে স্কুল থেকে ফিরলে আসলামের মা বলেন, তোর চাচি এসেছিল। আজকে তোকে পড়াতে যেতে বলেছেন। এমনেই ইচ্ছে করছিল, তার ওপরে মায়ের নির্দেশ পেয়ে আসলাম তাড়াহুড়ো করে নাহারদের বাড়িতে যায়। দুই ভাই-বোনই পড়তে এলো। আজমল বলল, আমি বেশিক্ষণ পড়তে পারব না, শোভারামপুর স্কুলে হা-ডু-ডু খেলতে যাব। যেই কথা, সেই কাজ। ঐকিক নিয়মের দুতিনটি অঙ্ক শিখেই দে দৌড়। এতেঠক্ষণ আসলাম নাহারের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে নাই। এমনকি আজমলের উপস্থিতিতে নাহারের প্রতি ভালোভাবে তাকিয়েও দেখে নাই। নাহার আজকে বড়ো বোনের দেয়া গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে। সাথে ম্যাচিং জর্জেটের ওড়না। তাছাড়া আপার বিউটি বক্সের জিনিস ব্যবহার করে সে একটু সেজেছে। ওকে আজ বয়সের চেয়ে একটু বেশি বাড়ন্ত এবং সুন্দরী দেখাচ্ছে। আসলাম তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিল না।

– কী দেখছেন? নাহারের প্রশ্নে আসলাম সম্বিৎ ফিরে পায়।

– তোমাকে আজ খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে, আসলাম উত্তর দেয়।

– কেন আমি কি এতোদিন সুন্দর ছিলাম না? নাহার আবার একটু অভিমানের সুরে প্রশ্ন করে।

– হয়তো ছিলে, আমি হয়তো ওভাবে লক্ষ করিনি। আসলাম উত্তর দেয়।

– কেন লক্ষ্য করেননি? আপনি কী শুধু আপনার ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের প্রতি তাকান? নাহার পালটা প্রশ্ন করে। আসলাম কোনো কথা বলতে পারে না, লজ্জায় কিছুটা মাথা নত করে। আসলেও ক্লাসের মেয়েদের প্রতি সে তেমনভাবে তাকায় না। ওদের ক্লাসে ষোলোজন ছাত্র এবং সাতজন ছাত্রী। ছাত্রীরা সবসময় শ্রেণি কক্ষে থাকে না। শুধু ক্লাস নেওয়ার সময় কমনরুম হতে শিক্ষকের সাথে শ্রেণিকক্ষে আসে; পড়ানো শেষ হলে আবার শিক্ষকের সাথে লাইব্রেরির কমনরুমে চলে যায়। তবে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় পথে ওদের সাথে কথাবার্তা হাসাহাসি হয়। তাছাড়া, আসলাম ক্লাসে ফাস্ট বয় এবং ক্যাপ্টেন বলে ক্লাসের রুটিন এবং শিক্ষকদের দেয়া বাড়ির কাজ ইত্যাদি ব্যাপারে মেয়েরা ওর সাথে যোগাযোগ করে। তবে, আসলাম অতি ভদ্র ছেলে হিসেবে কোনো মেয়ের প্রতি ভালোভাবে তাকায় না। এ

নিয়ে অনেক মেয়েরা আসলামকে দেমাগি বলে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না। আজকে নাহারের দিকে তাকিয়ে আসলাম কি যেন নতুন কিছু খুঁজে পায়। তার মনপ্রাণ, দেহে যেন একটু ঝড়ের শিহরন বয়ে যায়। সেই ঝড় আসলামের মধ্যে এতো দিনের লালিত আত্মমর্যাদাবোধ, অহংবোধ এবং দেমাগি মনের দৃঢ় বাঁধন ভেঙে চুরমার করে দেয়। নাহারের প্রতি সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। পাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তাই আসলাম কৃত্রিম দৃঢ়তার মাঝে নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

–দেখি গতদিনের অঙ্কগুলো কতটুকু প্র্যাকটিস করেছ। না পারলে কিন্তু আজ মার খাবে। আসলাম কথাগুলো কবিতার মতো বলে যায়।

–অবশ্যই মারবেন, দেখুন না বেত এনে রেখেছি, নাহারও দৃঢ়তার সাথে উত্তর দেয়। আসলাম তাকিয়ে দেখে, সত্যই নাহার একটি বেতের টুকরা এনে রেখেছে। নাহারের মা আমেনা বেগমের অম্ল এবং পিত্তের রোগ আছে বলে প্রায়ই বেতের কঁচি ডগা ভেজে খান। সেখান থেকেই এই বেতের সংগ্রহ।

আসলাম নাহারকে দুটি অঙ্ক করতে দেয়। প্রথমটি পারলেও দ্বিতীয়টির ভাগ শেষ মিলাতে ভুল করে বসে। এতো সহজ অঙ্ক না পারাতে আসলাম কিছুটা রাগান্বিত হয়।

– কী দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে? হাত পাতো। আসলাম একজন প্রকৃত শিক্ষকের মতো হুকুম দেয়।

নাহার এবার সত্যই কিছুটা আতঙ্কিত হয়। ভয়ে ভয়ে ডান হাতটি সামনে এগিয়ে দেয়। আসলাম বেতটি দিয়ে নাহারের হাতে জোরে কষে বাড়ি দেয়। বেতের আঘাতটি একটু বেশি হয়ে যায়। নাহারের গোলাপি হাতের তালুতে লালচে দাগ পড়ে যায়। ব্যথায় ওর চোখে পানি আসে। বলে, আমাকে এত জোরে মারলেন! আপনার কি একটুও দয়ামায়া নাই? আসলাম তার কৃতকর্মের জন্য হতবিহ্বল হয়ে যায়। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। সে পরক্ষণেই হঠাৎ করে নাহারের হাতটি টেনে নিয়ে ঠোঁটে-মুখে, ছোঁয়ায়। নাহার ডুকরে কেঁদে উঠে হাতটিকে সরিয়ে না নিয়ে আসলামের চোয়ালে চেপে ধরে। সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায়। এবার নাহারের চোখে সুখ এবং আনন্দের অশ্রু; যেন নতুন সৃষ্টি সুখের উল্লাস। আসলামের মধ্যেও এক মহা প্রলয় ঘটে যায়, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণু-পরমাণুর মধ্যে এক নতুন শিহরনের ঝাঁকুনি অনুভব করে। সে নাহারের হাতটি আরও

শক্তভাবে মুখের সাথে চেপে ধরে বলে, আমাকে ক্ষমা করে দিও নাহার, বুঝতে পারি নাই আঘাতটি এত জোরে হবে। নাহার আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে অস্ফুট স্বরে বলে, কেন ক্ষমা চাচ্ছেন? পড়া না পারলে এভাবেই আপনি আমাকে মারবেন এবং আদর করবেন। আমি চিরদিন আপনার আদর পেতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই। কিছুক্ষণ পরে আসালম নাহারের হাতটি ছেড়ে দিলে নাহারও নিজেকে গুঁটিয়ে নেয়। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। তবে সেদিন আর পড়ানো হয় না। বিদায়ের সময় আসলাম বলে, তোমার মধ্যে আমি আজ এক মহা মূল্যবান রত্ন খুঁজে পেয়েছি, আমি চিরদিন তোমাকে বুকে আগলে রাখতে চাই। নাহার মৃদু হেসে বলে, আমিও তাই চাই। আল্লাহ যেন আমাদের দুজনের মনের আশা পূরণ করেন।

ইদানীং পাকিস্তানি আর্মিরা নানাভাবে বাঙালিদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচারেরে মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা চলার পথে বাড়িঘরে ঢুকে মেয়েদের প্রতি বলাৎকার করছে এবং জোর করে গৃহপালিত গরু-ছাগল, হাস-মুরগি নিয়ে যাচ্ছে। আসলামদের বাড়ি বড়ো রাস্তার পাশে। একদিন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে তিনজন সেপাই বাড়িতে ঢুকে উর্দুতে গালিগচালাজ শুরু করে; এবং আসলামের বড়ো ভাইকে ৩০৩ রাইফেল দিয়ে আঘাত করে বলে, যেখান থেকে পারো ছাগল এবং মুরগি এনে দাও। আসলামদের বাড়ি ঘেঁষেই একটি বড়ো বটের গাছ–সেই গাছের ডালে ৪/৫টি মৌচাক পড়েছে। আসলামের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায়। সে তার চাচাতো ভাই আজাদকে নিয়ে মৌচাকে কয়েকটি ঢিল ছুঁড়ে; তার আগে বাড়ির সবাইকে সতর্ক করে। ঝাকে ঝাকে মৌমাছি এসে তিনজন পাকিস্তানি সেপাইকে আক্রমণ করে।

– এয়া কিয়া চিজ হায়, তোম লোক এয়া কি করতা হায়? সৈনিকেরা চিৎকার করে। মৌমাছির হুল ফোঁটানোর ব্যথায় তারা কুঁকড়াতে থাকে এবং হাতের রাইফেল ফেলে বন্যায় ডোবা গ্রামের দিকে দৌড়াতে থাকে। পানি কাদার মধ্যে হেঁটে ও দৌড়ে শোভারামপুর রেল লাইনের কাছে পৌঁছালে গ্রামের কিছু লোক ঘৃণা ও রাগে লাঠি-বৈঠা দিয়ে দুই পাকিস্তানি সেনাকে পিটাতে থাকে। একপর্যায়ে গনি দফাদার তাদেরকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বাহিরদীয়া ব্রিজের রাজাকার ক্যাম্পে পৌঁছে দেন। বিকেলেই দুঃসংবাদ! পাকিস্তানপন্থি খলিল শেখ এসে আসলামের বাবাকে বলেন, ছেলেকে সরাও। আর্মিরা খবর পেয়ে গেছে, তোমার ছেলেই

সকালে মৌমাছির চাকে ঢিল ছুড়েছিল। আসলামও ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। বাবার নির্দেশে সেদিনেই দয়ারামপুরে মামার বাড়িতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। রাতেই চাচাতো ভাই আজাদকে সাথে নিয়ে বাড়ি ত্যাগ করে। বাড়ি হতে বের হয়ে আজমলদের বাড়িতে যায়। আসলাম নাহারের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মৃদ কান্নার আওয়াজ পায়। বুকে একটু সাহস সঞ্চয় করে নাহারকে একটু কাছে টেনে নিয়ে আলতো করে চিবুকে হাত বোলায়। নাহার সবকিছু আগেই শুনেছে। সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, আপনি চলে গেলে আমি কীভাবে বাঁচব? আসলাম কোনো কথা না বলে নাহারের ডান হাতটি টেনে নেয় এবং নিজের হাতের মুক্তা বসানো রুপার আংটিটি খুলে নাহারের মধ্যমা আঙুলে পরিয়ে দেয়। তারপর কোনো কথা না বলে ঝড়ের বেগে বের হয়ে যায়।

রাতেই আসলাম কয়েকজন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া যুবকদের সাথে গোয়ালন্দ হয়ে বড়ো নৌকায় পদ্মা পাড়ি দেয় এবং শিবালয়ের আরিচার তেঁওতা জমিদার বাড়ির ভাঙা দালানে আশ্রয় নেয়। পরদিনই যমুনার পাড় দিয়ে– গ্রামের পথে হেঁটে টাঙ্গাইলের পাহাড়ি এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। তখন আর ভারতে যাওয়ার সময় ছিল না বলে ওরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং লাভ করে। উদ্যমী এবং অকুতভয় সাহসী হিসেবে আসলাম শীঘ্রই কমান্ডারদের নজরে আসে। কাদেরিয়া বাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে বিশেষ করে ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে দুরন্ত দুর্ধর্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে। তারা অনেকগুলো পুল কালর্ভাট ধ্বংস করে এবং পাকিস্তান নৌবাহিনীর অস্ত্র গোলাবারুদ এবং রসদবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। আসলাম অনেকগুলো অপারেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং অদম্য সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সে ঐতিহাসিক জাহাজমারার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। একাত্তরের আগস্ট মাসের ১০ তারিখে কাদেরিয়া বাহিনী অস্ত্র গোলাবারুদ ও জ্বালানি সুদ্ধ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটি জাহাজে আক্রমণ করে। সিরাজকান্দিতে যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীর অভিসরণ বিন্দুতে কাদেরিয়া বাহিনী এই দুঃসাহসী আক্রমণ পরিচালিনা করে। কমান্ডার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত সেদিনের যুদ্ধে আসলাম ও সহযোগী যোদ্ধারা কোমরে ডিনামাইট বেঁধে পানির নিচে ডুব দিয়ে ঘাটে ভেরা ৭টি জাহাজের দুটিতে ডেটোনেটর চার্জ করে। দুটি জাহাজই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়। যুদ্ধে ২০-২৫ জন

পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই যুদ্ধে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় এবং আসলামের ডান হাতের একটি আঙুল উড়ে যায়।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পনের পরে মুক্তিযোদ্ধারা নতুন সরকারের কাছে অস্ত্র সংবরণ করলেও কাদেরিয়া বাহিনী বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করে। কাজেই যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে আসলেও আসলামদের এক রকম জোর করে টাঙ্গাইলের পাহাড়ী এলাকায় আটকে রাখা হয়। ইতিমধ্যে আসলাম ফরিদপুরের বাড়িতে থাকা বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনদের খবরাখবর নিতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে নাহাররা কেমন আছে জানতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। বিদায়ের সময় নাহারের আঙুলে পড়িয়ে দেয়া আংটির কথা, নাহারের হাতের ছোঁয়া এবং চোখের পানি ওর মনের মধ্যে নতুন করে আবেগের তুফান তোলে। মুহূর্তের মধ্যে আসলামের মনের দৃশ্যপটে নাহারের সকল স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠে।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে আসেন। ২৪ জানুয়ারি টাঙ্গাইল শহরের বিন্দুবাসিনী স্কুলের মাঠে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকের নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনীর ৪০,০০০ সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে অস্ত্র সংবরণ করে। আসলাম সেদিন তার কাছে থাকা জাহাজমারা যুদ্ধে পাওয়া চাইনিজ রাইফেলটি জমা দেয়।

পরদিনই সে আজাদকে নিয়ে নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। পথে নানা প্রতিকূলতাঃ গাড়ি নাই, ঘোড়া নাই, নৌপথে লঞ্চ নাই। অতি কষ্টে পায়ে হেঁটে, যমুনার পাড়ে এসে একটি ছোটো নৌকায় করে নদী পার হয়ে রাতে কোনো রকমে দুজনে গোয়ালন্দের উজানচরে মেজো ফুপুর বাড়িতে উঠে। বাবা-মা ভালো আছে শুনে মনে শান্তি আসে। তবে, ওদের বাড়ির কাছে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে শুনে মনটা আঁতকে উঠে। নানা চিন্তায় ঘুম আসে না। নাহারদের আবার কিছু হলো নাকি! শেষ রাতেই কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা হয়। পথে একটি ভ্যান রিকশা পাওয়াতে সুবিধা হয়। সকালের সূর্য উঠার আগেই তারা বাড়ির কাছে পৌঁছে যায়। আসলাম প্রথমেই নাহারদের বাড়িতে ছুটে যায়। একী! শূন্য বাড়ি; সকল ঘরের দরজা খোলা–আসবাবপত্র শূন্য। কেউ কোথাও নাই। আসলাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো উচ্চস্বরে আজমল ও নাহারের নাম ধরে ডাকে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ

নাই। ইতিমধ্যে আসলামের বাবা, ভাইয়েরা ওই বাড়িতে ছুটে আসে। সব ঘটনা শুনে আসলাম ভয়, দুঃখ-বেদনায় নির্বাক হয়ে যায়।

তখন প্রবল বন্যায় রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা রাজাকারদের সহায়তায় নৌকায় করে গ্রামে গ্রামে টহল দিতে শুরু করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে অত্যাচার করে গুম করে। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। ধুলদীহাট এলাকায় অপারেশন চালিয়ে পাক সেনারা নৌকা করে ফরিদপুর শহরে ফিরছিল। সিএন্ডবি রাস্তার খাল দিয়ে এগিয়ে কোমরপুর হয়ে নৌকাটি আসলামদের বাড়ি পার হয়ে আজমলদের বাড়ির কাছে আসে। নৌকা থেকে ওই বাড়ির উঠানে দুটি মেয়েকে বসা দেখে ক্যাপ্টেন সাহেব নৌকা থামাতে বলেন এবং সাথে থাকা দুই রাজাকারকে হুকুম করেন, একটি মেয়েকে ধরে আনতে। সাথে সাথে দুই রাজাকার এবং একজন পাকিস্তানি সেপাই নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বড়ো মেয়েটিকে টেনেহিঁচড়ে নৌকার কাছে নিয়ে আসে। মেয়েটির আত্মচিৎকার এবং বাড়ির মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। ক্যাপ্টেন সাহেব জানতে পারেন, মেয়েটির সদ্য বাচ্চা হয়েছে। সে সেপাহীটিকে উর্দুতে গালি দিয়ে এই নোংরা মেয়েটিকে রেখে অন্য মেয়েটিকে নিয়ে আসতে বলেন। ওরা আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে ওই মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওরা ছোটো মেয়েটিকে খুঁজতে থাকে। একপর্যায়ে ঘরের কোণে কাঠের আলমারির পেছনে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে বসে থাকা মেয়েটির আঙুলের আংটির ওপর টর্চের আলো পড়ে। মেয়েটিকে ওরা পাঁজাকোলা করে নৌকায় তুলে আনে।

রাতেই আজমলের বাবা সালাম সাহেব শহরের শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান আফজাল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে স্কুলে পড়ুয়া মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করেন। আফজাল সাহেব পরদিন স্টেডিয়ামের মিলিটারি ক্যাম্পে যেয়ে খোঁজখবর নিবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু এরপরে অনেকবার শান্তিকমিটির লোকজনের কাছে ধরনা দিয়ে, অনেক ঘোরাঘুরি করেও মেয়েটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। মেয়েটিকে উদ্ধারে কারো তেমন কোনো সহযোগিতা না পেয়ে সালাম সাহেবের পরিবার দুঃখ-কষ্ট এবং হতাশায় ভেঙে পড়ে। তারপর রাগে-দুঃখে, অভিমানে একদিন বাড়ির আসবাবপত্র একটি গরুর গাড়িতে তুলে সালাম সাহেব টেকের হাটে ছোটো ভাইয়ের বাড়িতে চলে যান।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বজনহারা মানুষের কান্না থামে নাই। ফরিদপুর শহরের অনেক জায়গায় গণকবরের সন্ধান মিলছে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বের ধানক্ষেতে একটি বড়োসড় গণ কবরের সন্ধান মেলে। মাটি খুঁড়লে ৩০/৪০ জন নারী-পুরুষের গলিত লাশ এবং কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। শাড়ির আঁচলে এক গুচ্ছ চাবি দেখে বদরপুরের শ্রাবন্তী দাসের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়। আসলাম স্কুল হতে এই খবর পেয়ে সহপাঠী বন্ধু কাওসার ও আনোয়ারকে নিয়ে স্টেডিয়ামের দিকে ছুটে যায়। ইতিমধ্যে অনেকগুলো উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ আংশিক গলিত নারী পুরুষের লাশ উঠানো হয়েছে। অনেকে আত্মীয়স্বজনকে শনাক্ত করতে পেরে নিরবে এবং উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করছে। আসলাম সামনে এগিয়ে যায় এক তীব্র আবেগে ও সম্মোহনী শক্তিবলে। সে মুখে মাফলার বেঁধে লাশের স্তূপের কাছাকাছি যায় এবং পাগলের মতো কি যেন খুঁজতে থাকে।

হঠাৎ নজরে আসে একটি অর্ধগলিত হাত লাশের স্তূপের মাঝে ঝুলছে এবং মাংসবিহীন হাতের একটি আঙুলে আটকানো একটি অসচ্ছ সাদা পাথরের আংটি দেখা যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে একটি গোলাপি আঙুলে জ্বাজল্যমান ধবধবে সাদা মুক্তাদানা।

আসলাম চিৎকার দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেই অভিশপ্ত অঙ্গুরীয়টিকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে; এবং অতঃপর সম্বিৎ হারায়।

অসমাপ্ত প্রতিশোধ

১৯৪৭ সালে দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়ে ভারতবর্ষ ভেঙে স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের দু'টি অংশ: পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে নানা বৈষম্য বঞ্চনার ইতিহাস শুরু হয়। পশ্চিমা শাসকরা নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর অত্যাচার, অবিচার এবং ভাষা সংস্কৃতির উপর আক্রমণ শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী মানুষ ১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে বাঙালিদের রক্ত ঝরলে স্বাধীকার আন্দোলনের সূচনা হয়। বছরের পর বছর তীব্র গণআন্দোলন শেষে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর বাঙালিরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিল যে, এবার পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল হবে এবং আওয়ামীলীগের ৬ দফার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হবে। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য প্রস্তাবিত পাকিস্তান জাতিয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতাকামী বাঙালিদেরকে বিচ্ছিনতাবাদী ও পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ এবং নতুন ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাজপথে নেমে আসে এবং অবিরাম অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম", "এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এই সফল এবং সমুজ্জ্বল জনসমাবেশের পর পূর্ব

পাকিস্তানের নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু ও বাঙালিদের হাতে চলে আসে। এমন পরিস্থিতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আরেক নতুন ষড়যন্ত্রের অবতারণা করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে প্রহসনমূলক নাটক শুরু করেন। আলোচনার অন্তরালে পশ্চিম পাকিস্তান হতে নৌ ও আকাশ পথে সৈন্য, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এনে জমা করা হয়। অতঃপর সকল আলোচনার পথ রুদ্র করে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে নিষ্ঠুরতম গণহত্যার আদেশ দিয়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যাবেলা ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়ালতম কালো রাতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ট্যাঙ্ক, মর্টার ও কামান নিয়ে হায়ানার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, এবং পার্শ্ববর্তী আবাসিক এবং বস্তি এলাকায় নির্মমভাবে গুলি করে এবং অগ্নিসংযোগ করে হাজার হাজার নারী পুরুষকে হত্যা করে। তাছাড়া, রাজারবাগে পুলিশ ও পিলখানায় ইপিআর হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ করে অগণিত বাঙালি প্রতিরোধকারীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে কুখ্যাত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিকল্পিত গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনকে সশস্ত্র হামলার দ্বারা দমন করতে চেয়েছিল। এই গণহত্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক এবং সামরিক জান্তার আদেশে পরিচালিত, যা ১৯৭০ এর নভেম্বরে সংঘটিত "অপারেশন ব্লিটজ" এর পরবর্তী পরিকল্পিত সামরিক আক্রমণ।

২৫ মার্চে সামরিক অপারেশনের আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় শহর দখল করে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারী রাজনৈতিক ও সামরিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসা হতে পাকিস্তানি কমান্ডো বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিআর-এর ওয়ারলেসে গোপন বার্তার মাধ্যমে "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র" হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ প্রচারিত হয়।

মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইনের মতে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাতেই প্রায় লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয় এবং গ্রেফতার করা হয় আরো প্রায় দশহাজার জনকে। শুধু ঢাকা নয়, পাকিস্তানি সৈন্যরা সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে

হত্যাযজ্ঞ, অমানবিক নির্যাতন ও জ্বালাও পোড়াও শুরু করে। রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো কাক-শেয়াল ও শকুনের খাবারে পরিণত হয়।

গণহত্যা শুরুর পর থেকে হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে বাঙালি জাতিয়াতাবাদী আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সমর্থকগণ এবং হিন্দু ধর্মালম্বীরা বাড়িঘর ছেড়ে নিকটবর্তী বর্ডার অতিক্রম করে শরনার্থী হিসাবে ভারতে আশ্রয় নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রজনতা, পুলিশ, ইপিআর এবং সামরিক বাহিনী হতে পালিয়ে আসা সদস্যবৃন্দ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। পাকিস্তানের ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী এবং আধুনিক অস্ত্রের সাথে টিকতে না পেরে দলে দলে ছাত্রজনতা ভারতে আশ্রয় নেয়। এপ্রিলের ১০ তারিখে মুজিব নগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় এবং এই সরকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানিসেনাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা দেয়। কর্নেল (অবঃ) আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

পর্যায়ক্রমে ভারতের বিভিন জায়গায় প্রায় ১১৫ টি ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ হতে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শুরু হয়। ১ মে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য বিহারের চাকুলিয়ায় সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলে ভারত সরকার। সেখান থেকে পরবর্তীতে প্রায় ২০ লাখ মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং গ্রহণ করে। রাজশাহীর বালুরঘাট বর্ডার ছাড়াও সীমান্তবর্তী বর্ডারসমূহ দিয়ে বাংলাদেশ হতে আসা হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য জড়ো করা হয়।

সার্জেন্ট দেলবীর সিংহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন চৌকস এবং অভিজ্ঞ শারীরিক প্রশিক্ষক (Physical Instructor)। তিনি ভারতের গোর্খা বাহিনী থেকে একজন এনসিও হিসেবে কঠিন এবং কষ্টকর জিটিআই (GTI) কোর্স করেছেন এবং হায়দারাবাদ থেকে সিনিওর কমান্ডো কোর্স সম্পন্ন করে গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। রাজস্থানের জয়পুরের অধিবাসী দেলবীর সিংহ-এর বাবা সুবেদার মেজর বলরাম সিংহ ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে প্রাণ হারান। তিনিও একজন জিসিআই যা জেনারেল শারীরিক প্রশিক্ষক ছিলেন। যুদ্ধে বাবার মৃত্যুতে দেলবীর সিংহ এর মনে পাকিস্তানের উপর কঠিন ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল। কাছেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং দেয়ার সুযোগ পেয়ে সে খুবই আনন্দিত হয়–যাতে করে তার হাতে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে।

বাংলাদেশ হতে আসা ছাত্র-যুবকদেরকে কঠিন পরিশ্রম এবং কসরতের মাধ্যমে শারীরিক পুষ্টতা, ফিটনেস ও রণকৌশলের ট্রেনিং দেয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য সকল ফিল্ড ট্রেনিং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রুটিনভুক্ত করা হয়, যাতে চরম প্রতিকুলতা এবং বৈরী পরিবেশে মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ণ ফিটনেস নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে।

সেদিন কিছু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বাধা অতিক্রয় (Obstacle Crossing) ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিল, যা একটি প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের জন্য অপরিহার্য। ক্রলিং করে বা লাফিয়ে খাল পার হওয়া, তাঁরকাটা (Barbed Wire) বেড়া অতিক্রম করা, উঁচু দেয়াল টপকানো, সারভাইভাল টেস্ট (Survival Test)-সবকিছুই মুক্তিযোদ্ধাদের করতে হতো। দেলবীর সিংহ ট্রেনিং পরিচালনা করছেন। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দৌড়ে, দুই হাত দিয়ে মইয়ের মতো বেয়ে ৭ ফুট দেয়াল টপকাতে হবে। প্রায় সবাই প্রথম চান্সে অতিক্রম করতে পারলেও কয়েকজনকে একাধিকবার চেষ্টা করতে হলো। সার্জেন্ট দেলবীর সিংহ লক্ষ্য করলেন, একটি ১২/১৩ বছরের ছেলে কাঠবিড়ালীর মতো অভিনব কায়দায় লাফ দিয়ে দেয়ালের উপরে বসে ঝুপ করে ওপাশে পড়েছে। তিনি যেন চোখে ঝাঁপসা দেখলেন। এটা কি করে সম্ভব? তিনি পাশে থাকা ফয়েজ আহমেদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুর্ধর্ষ সাহসী ছেলেটি কে? ফয়েজ আহমেদ ওস্তাদকে ঐ ছেলেটির পারিবারিক পরিচয় এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন। ছেলেটিও আলোচনায় যোগ দিল।

খালিশপুর থানাটি খুলনা শহরের শিল্পাঞ্চলখ্যাত ভৈবর নদীর তীরে অবস্থিত। বৈকালী সিনেমা হল পার হলেই রেলওয়ে লাইন এবং তারপরে সুলতানপুর গ্রাম। গ্রামটির সাথে খালিশপুরের একটি সংযোগকারী আধাপাকা রাস্তা আছে। সেই রাস্তার পাশে আবেদ আলী খালাসির বাড়ি। আবেদ আলি খালাসির বাপদাদারা ব্রিটিশ আমলে জাহাজের খালাসি বা নাবিকের কাজ করতো। তবে এই প্রজন্মের কেউ আর এ পেশায় নাই। আবেদ আলী খালাসিরা তিন ভাই, সবাই বর্তমানে চালের ব্যবসার সাথে জড়িত। খালিশপুরে তাদের যৌথ চাতাল আছে। জেলার বিভিন্ন জায়গা হতে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে এনে ডোঙায় সিদ্ধ করে ধান ভাঙানোর মেশিনে চাল তৈরি করা হয়। গ্রামের বাড়িতে আবেদ আলী খালাসির বেশ জমিজমা আছে, রাখাল কৃষাণ দিয়ে জমি চাষ করেন। সেই জমিতে পাট

হয়, ধান হয় এবং শীত মৌসুমে রবি শস্য হয়। আবেদ আলি খালাসির তিন সন্তান। বড় মেয়ে রোকশানার বয়স ১৬/১৭ বছর, সে খালিশপুর রেলওয়ে কলোনী স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। এর পরে পিঠাপিঠি দুই ছেলে: আলমগীর এবং জাহাঙ্গীর। আলমগীরের বয়স ১৩ এবং জাহাঙ্গীরের বয়স ১২ বছর। দুজনেই স্থানীয় স্কুলের ষষ্ট শ্রেণির ছাত্র। দুজনেই খুব মেধাবী এবং প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। রোকশানা দেখতে বেশ সুন্দরী এবং বয়সের তুলনায় তার বাড়ন্ত শরীর। আবেদ আলি পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রোকশানার মেট্রিক পরীক্ষার পরে আপন বড় ভাইয়ের ছেলে ইউসুফের সাথে তার বিয়ে দিবেন। ইউসুফ খুলনার বি এল কলেজ হতে ফার্স্ট ডিভিশনে আই এস সি পাস করার পর ঢাকায় আহসান উল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে সে ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরুর আগেই খুলনা শহরে শতেক খানেক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি ফরিদপুর এবং যশোর হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সাঁজোয়া যান খুলনায় প্রবেশ করে। কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তানিসেনারা খুলনা জেলার সবগুলো থানা শহর এবং বন্দর এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এতে অনেক লোক হতাহত হয়। খালিশপুরের রেলওয়ে বিহারি কলোনির লোকেরা পাকিস্তানি সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র পায়। বিহারিরা স্থানীয় জামাত, মুসলীমলীগ নেতাকর্মী এবং রাজাকার আলসামস সদস্যের সমন্বয়ে এক বিরাট এন্টিস্বাধীনতা বাহিনী গড়ে তোলে। তারা পাকিস্তানিসেনাদের সহায়তায় স্থানীয় বাঙালি, বিশেষ করে আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মী ও হিন্দুধর্মালম্বীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানের মতো খালিশপুরেও ব্যাপকভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রান্ত হয়; গরুছাগল, মালামাল, খাটপালং-ঘরদরজা সবই লুট হয়ে যায়। এমনকি তাদের জমিজমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও পাকিস্তানি দালালরা দখল করে নেয় এবং তাদের যুবতি মেয়ে-বউদের উপর পাশবিক বলৎকারের ঘটনা ঘটে। এর ফলে দলে দলে লোক সবকিছু ছেড়ে সহায় সম্বলহীনভাবে বর্ডার পাড়ি দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় শিবিরে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়।

আবেদ আলী খালাসির গোটা পরিবাই আওয়ামীলীগপন্থী। বড়ভাই বয়রা থানার আওয়ামীলীগের সেক্রেটারি এবং তার বেয়াই সিদ্দিকুর মুন্সী ১৯৭০

সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের এম এন এ নির্বাচিত হন। এর ফলে খালাসি পরিবারের প্রতি স্থানীয় পাকিস্তানি দালাল এবং বিহারিদের কুনজর পড়ে। তারা পাকিস্তানিবাহিনীর অফিসার এবং সৈনিকদেরকে বোঝায় যে, খালাসী বাড়ির লোকজন পাকিস্তানবিরোধী এবং তাদের বাড়িতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় প্রশ্রয় পাচ্ছে।

মে মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানিসেনারা স্থানীয় রাজাকার, বিহারি এবং দালালদের সহায়তায় এম এন এ সিদ্দিকুর রহমানের বাড়িতে আক্রমণ করে। তারা আশেপাশের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সিদ্দিকুর রহমানের দুই ভাই এবং ভাতিজাদেরসহ ১৩ জনকে গুলি করে এবং বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। তাছাড়া তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া কলেজ পড়ুয়া এক ভাগ্নিকে পাকিস্তানি আর্মিরা তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ভৈরব নদীতে সেই মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত লাশ ভেসে উঠতে দেখা যায়।

মুন্সীবাড়ির হত্যাকাণ্ডের পর আবেদ আলি খালাসির পরিবার মহা চিন্তায় পড়ে যায়। বাড়িঘর ছেড়ে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিবে, ভেবে কূল কিনারা পায় না। রাতে স্ত্রী রাবেয়া বেগমের সাথে আলাপ করে সীদ্ধান্ত নেয়, আগামী শনিবারেই অমাবস্যা রাতের অন্ধকারে তারা পার্শ্ববর্তী সোনাভাঙ্গা থানার তপশী গ্রায়ে শশুর বাড়িতে চলে যাবেন। তারা ছেলে মেয়ে, পাড়া-পড়শীদের না জানিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

কিন্তু তার আগেই মহা বিপর্যয় ঘটে যায়। সেদিন ছিল শুক্রবার। ছেলে মেয়েদের স্কুল বন্ধ। চালের আড়ত বন্ধ বলে আবেদ আলি খালাসি আজকে বাড়িতেই আছেন। তাছাড়া, আগামীকাল রাতে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবেন বলে একটু গোছগাছ করার জন্য মনস্থির করেন। বেলা ১১ টার দিকে হঠাৎ উত্তর পাড়ার দিক থেকে চিৎকার ও উচ্চ শোরগোলের আওয়াজ পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিহারি পাড়ার কুখ্যাত জাবেদ কসাই দশ-বারজন লোক নিয়ে আবেদ খালাসির বাড়িতে ঢুকে। সঙ্গে স্থানীয় চার পাঁচজন রাজাকার, জামাত নেতা করিম ভরসা, কয়েকজন উর্দুভাষী বিহারি এবং ৪ জন পাকিস্তানিসেনা। রাজাকার এবং পাকিস্তানিসেনারা খাকি ইউনিফরম পরিহিত এবং হাতে বন্দুক রাইফেল। অন্যদের হাতে তরবারী সদৃশ ছোরা বা কিরিচ। জাবেদ কসাই হুংকার দেয়, কোথায় আবেদ হারামকা বাচ্চা? বের হ শিগগির। আবেদ আলী ঘর হতে বের হয়ে আসে। পার্শ্বের বাড়ি থেকে তার বড় ভাই বাতেন হাজী ও চাচাতো ভাই ছবেদ আলিও এদিকে এগিয়ে আসে।

পড়ার ঘর থেকে আলমগীর ও জাহাঙ্গীর বের হলে তাদের পিতা আবেদ আলী খালাসি হাতের ইশারায় তাদেরকে পালাতে বলেন। ওরা দুই ভাই গরুর গোয়ালের পাশের খড়ের পালার মাচানের নিচে ঢুকে পড়ে। দুর্বৃত্তরা প্রথমেই আবেদ আলী খালাসি এবং তার বড় ভাই বাতেন হাজীকে গামছা দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। তার পর জাবেদ কসাই চিৎকার দিয়ে বলে, হারামজাদারা আওয়ামীলীগ করস! এইবার মজা দেখ। এই বলে পর পর দুজনের পেটের মধ্যে কিরিচ ঢুকিয়ে দেয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ে, তারা মরণ চিৎকার দেয়। খড়ের পালার নিচ থেকে এই দৃশ্য দেখে দুই ভাই ভয়ে কাঁপতে থাকে। এর মধ্যে রান্নাঘর থেকে ওদের মা দৌড়ে বের হয়ে স্বামীর রক্তাক্ত দেহের উপরে লুটিয়ে পড়ে বলেন, এ তোমরা কী করছো? তোমাদের কি কোনো মায়া-দয়া নাই? একজন রাজাকার তাকে টেনে তুলে দাঁড় করায়। জাবেদ কসাই তার চুলের মুঠি ধরে টেনে মাথার কাপড় খুলে ফেলে এবং বলে, হারামজাদী! তোর এত মায়া করা দেখাচ্ছি। এই বলে সঙ্গী বিহারি রাজাকারটিকে বেয়নেট চার্জ করতে বলে। সে রাবেয়া বেগমের গলার নিচে বেয়নেট চার্জ করে।–মারে, ও আল্লারে বলে সেও মাটিতে নেতিয়ে পড়ে। চোখের সামনে মায়ের এই মৃত্যুদৃশ্য দেখে ছোট ছেলে জাহাংগীর "ও মা" বলে চিৎকার দিতে গেলে বড় ভাই আলমগীর হাত দিয়ে ছোট ভাইয়ের মুখ চেপে ধরে, যাতে শব্দ বাইরে না যায়।

ইতিমধ্যে নিজের ঘরে চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকা রোকশানাকে রাজাকার-আলসামসের লোকেরা টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনে এবং বিবস্ত্র করতে শুরু করে। রোকশানা মা-বাবার রক্তাক্ত লাশ দেখে চিৎকার শুরু করে। পাশের বাড়িতে ঘুমন্ত ইউসুফ আলী এগিয়ে এসে তার বাগদত্তা স্ত্রী রোকশানাকে রক্ষা করতে গেলে জাবেদ কসাই বলে উঠে, এই তো রাজাকারের বাচ্চা! ঢাকা থেকে এসে এখানে পালিয়ে আছে। এই কথা শোনামাত্র একজন পাকিস্তানি সৈনিক তার বুকে রাইফেল তাক করে ফায়ার করে। সে রোকশানার পায়ের কাছে মৃত্যু যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ে। অতঃপর জাবেদ আলী দুইজন পাকিস্তানিসেনাকে সঙ্গে নিয়ে রোকশানাকে টানতে টানতে খড়ের পালার পাশে কাছারী ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং নিষ্ঠুর পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠে। ঘরের ভেতর হতে রোকশানার আত্ম চিৎকার ও গোঙানির আওয়াজ পাওয়া যায়। এর কিছুক্ষণ পরে একটি গুলির শব্দ শুনে দুইভাই ভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। এর মাঝে পাশের মসজিদের

ইমাম, জনাব মৌলানা রাসেল সাহেব এগিয়ে আসেন এবং ধমক দিয়ে বলেন, এই তোমরা ধর্মের নামে কেন এ অনাচার করছ? এ কথা শুনে জাবেদ কসাই রাগান্বিত হয়ে বলে, তুমি ফতোয়া দিচ্ছ? তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। এই বলে, জাবেদ কসাই তার হাতের কিরিচটি ইমাম সাহেবের পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর নরপিশাচরা তিনটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং যাবার বেলায় খড়ের পালাতেও জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ছুড়ে মারে। আলমগীর এবং জাহাঙ্গীর উপায়ন্তর না দেখে খড়ের পালার নিচ থেকে বের হয়ে নদীর দিকে দৌড় দেয়। ওদেরকে পালাতে দেখে একজন রাজাকার রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করে, কিন্তু ততক্ষণে দুইভাই অনেক দূরে চলে গেছে।

নদী পার হয়ে ওই দিনেই ওরা ১০/১২ মাইল পথ হেঁটে এবং দৌড়িয়ে সোনা ডাঙ্গায় মামার বাড়িতে চলে যায়। মা বাবা এবং বোনের মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্য দেখে ওদের মনে প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। সোনাডাঙ্গা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে অনেক যুবক এবং স্কুল কলেজের ছাত্ররা বর্ডার পাড়ি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। ওরা দুই ভাই ওদের মামাতো ভাই রমজানকে সঙ্গে নিয়ে একটি দলের সাথে মিশে দুদিন পরেই বনগাঁ বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তারপরে ট্রেন ও ট্রাকযোগে বিহারের চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে জোগদান করে। এতক্ষণ আলমগীর ও জাহাঙ্গীর দুই ভাইয়ের পারিবারিক ট্রাজেডি শুনে সবাই নির্বাক হয়ে যায়। সার্জেন্ট দেলবীর সিংহ এর চোখে পানি এসে যায়। পাশে বসে থাকা ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী আবেগে দুই ভাইকে বুকের মধ্যে টেনে নেন।

বয়সে ছোট হলেও দেলবীর সিংহের প্রত্যক্ষ ও তত্ত্বাবধানে দুই ভাই অস্ত্র চালনাসহ গেরিলা যুদ্ধের সফল ট্রেনিং শেষ করে। তাদের দুই ভাইয়ের মনে একটাই প্রতিহিংসা বা জিঘাংসার প্রচণ্ড জেদ, যেন তারা মা-বাবা বোনের হত্যাকারী জাবেদ কসাই এবং জামাত নেতা করিম ভরসাদেরকে হত্যা করতে পারবে। ট্রেনিং শেষে ওরা ফয়েজ বাহিনীর সাথে ছোট ছোট কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেয় এবং দুই ভাই বিশেষ করে আলমগীর বেশ সাহসিকতা ও নৈপুণ্যতার পরিচয় দেয়। নভেম্বরের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের চারিদিকের সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধে বেশ সাফল্য অর্জন করে। স্থানীয় রাজাকার, আলসামস এবং পাকিস্তানি সেনাদেরকে নানাভাবে পরাজিত করে গেরিলা বাহিনী ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকতে থাকে। ভারতীয় সেনা ও বিমানবাহিনী

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করতে থাকে। আলমগীর এবং জাহাঙ্গীর সহযোদ্ধাদের সাথে বয়রা বর্ডারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর বিখ্যাত বয়রার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল মূলত একটি আকাশ যুদ্ধ-যেটি ভারতীয় বিমান বাহিনী ও ভারতীয় আকাশ সীমায় অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। পাকিস্তানের সকল বাহিনীকে ঘনিষ্ট বিমান সহায়তা (Close Air Support) দিতে ঢাকা থেকে উড়ে আসা এফ-৮৬ স্যাবর জেটের পাইলটদেরকে ইন্দো-পাকিস্তানি সীমান্ত পেরোনোর দায়মুক্তির নির্দেশনা দেয়া হয়। এই আকস্মিক আক্রমণ মোকাবেলার জন্য ৪ টি ফোলল্যান্ড ন্যাট বিমান ভারতীয় বিমান ঘাঁটি কালাইকুন্ড হতে ছুটে আসে। দুই দেশের যুদ্ধ বিমানের মধ্যে ডগ ফাইটে (Dog Fight) দু'টি পাকিস্তানের স্যাবর জেটকে ভূপাতিত করা হয়। একজন পাইলট নিহত হয় এবং অন্যজন প্যারাসুট দিয়ে নেমে ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। এই যুদ্ধে ভারতীয় ১৪ নং পাঞ্জাব ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সকল যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনী দু'টি যুদ্ধ বিমান হারালেও রকেট ও বোমার আঘাতে ভারতীয় স্থল বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এই যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ১২ জন সৈনিক এবং ২ জন অফিসার প্রাণ হারায়। মুক্তিযোদ্ধারাও হতাহতের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের প্রশিক্ষিত ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে প্রতিহত করতে ভারতীয় সেনাদল আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেয়ার সময় হঠাৎ করে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর দুটি স্যাবর জেট নিচু দিয়ে উড়ে এসে রকেট ট্রাফিং করে। একটি রকেটের গোলা সরাসরি এসে ব্যাঙ্কারে পজিশন নেয়া আলমগীরের তল পেটে এসে লাগে। এতে তার শরীরের নিম্নাংশ উড়ে যায়। আলমগীরকে ধরাধরি করে ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সে নেয়া হয়। সেখানে সহযোদ্ধাদের সাথে ছোট ভাই জাহাঙ্গীরও ছুটে আসে। প্রচুর রক্তক্ষরণ থামাতে ডাক্তার ও নার্সরা প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

আস্তে আস্তে আলমগীর চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করে। সে ছোট ভাই জাহাঙ্গীরের ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। তারপর অস্ফুট স্বরে মিনতির ভঙ্গিতে বলে, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলাম না; আব্বা-মা এবং রোকশানা আপার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। দেশ শীঘ্রই শত্রুমুক্ত হবে, স্বাধীন হবে। আমার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞাটি অসমাপ্ত রয়ে গেল। তুই আমার অসমাপ্ত কাজটি করিস ভাই। এর পরে সবকিছু নিস্তেজ হয়ে যায়।